তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত গল্পকারদের ছোটগল্পে

লৌকিক বিষয় ও উপাদান

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাঢ় বাংলার জনজীবন নির্ভর করে সাহিত্য সাধনা করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য সাহিত্য মাত্রই জীবন নির্ভর। অঞ্চল ভেদে সেইসব স্থানিক মানুষের জীবনে ভৌগোলিক প্রভাবের সাথে সমাজ গঠন, অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর জীবনযাত্রা নির্ভরশীল। তারাশঙ্কর নিজে রাঢ় অঞ্চলের মানুষ। রাঢ় অঞ্চলে কাঁকুরে লাল মাটিতে তাঁর দেহ-মন মানুষের জীবন সত্যকে অন্বেষণ করেছে সতত। তারাশঙ্কর অনুধাবন করেছেন ভৌগৌলিক পরিবেশে কিংবা সেই পরিমণ্ডলে লালিত মানুষগুলির দুঃখময় জীবনকথার গভীর পরিচয়— যা দীর্ঘদিনের অবজ্ঞাত অবরুদ্ধ চিরায়ত ঐশ্বর্যের অনুসন্ধান দেয়। লেখক অবজ্ঞাত, অবহেলিত মানুষগুলির জীবনচর্যা কত সূক্ষ্মভাবে মমত্বযোগে প্রত্যক্ষ করেছেন, তারই পরিচয় রয়েছে গল্পগুলির মধ্যে।

রাঢ় অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে জমিদারের অত্যাচার মুখ্য হয়ে উঠেছিল। তাদের শোষণ ও নিয়ন্ত্রণে অর্ধশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষগুলি বোবার মতো বলা যায় অনুগত দাসত্বে গা ভাসিয়ে ছিল। সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণি না থাকার জন্যই জমিদার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধানের সীমা বেড়ে যায়। তবে লৌকিক ধর্মের চর্চায় রাঢ় অঞ্চল দীর্ঘকাল মজে ছিল। তার কারণ মুসলমান ধর্মের প্রভাব এই অঞ্চলে তেমন ছিল না বলেই ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলবার সুযোগ পেয়েছে। তারাশঙ্কর এই সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ গোষ্ঠীগুলোকে প্রত্যক্ষ করে তাদের জীবনের দুঃখ বেদনাকে সাহিত্যের পাতায় ঠাঁই দিয়েছেন। ফলে রাঢ়ের বেদে, বৈষ্ণব, সম্প্রদায় সাহিত্যগুণে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘকাল থেকেই বহু অনার্য উপজাতি রাঢ় অঞ্চলে বসবাস করত। তারা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হলেও নিজেদের মৌলিক গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয়নি। বাইরে থেকে তারা সামান্য প্রভাবিত হলেও ভিতরের দিক থেকে তাদের স্বকীয়তা রক্ষিত ছিল। এমনকী মুসলমান সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল। কিন্তু তুলনায় বৃহৎ সম্প্রদায়গুলো মুসলমান ধর্মের মধ্যে নিজেদের রক্ষা করে চলেছে। সেই জন্য বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের থেকে রাঢ় অঞ্চলের সমাজজীবন অনেকখানি স্বতন্ত্র। নিম্নশ্রেণির বৈষ্ণব সমাজের বিচিত্র আচার আচরণ ও বেদে সম্প্রদায়ের বিচিত্র জীবন কথা তারাশঙ্করকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ও সামাজিক সহাবস্থানের সমস্যায় পেশা বদল ঘটেছে। বেদেরা কলকারখানা কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে নিজেদের যুক্ত করেছে। তারা মুক্তির আনন্দে অজ্ঞাতবাস করলেও সৃষ্টির সৌজন্যে তারাশঙ্কর বেদে সম্প্রদায়ের জীবনচর্যাকে জীবন্ত করে গেছেন। রাঢ় বাংলার মধ্যে তাদের বসবাস থাকলেও বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির সাথে মনসা পূজা বিশেষ উৎসবের দিন বলে সমগ্র বাঙালি আজও মেতে ওঠে। সার্বজনীন পরবের

সাথে রাঢ়ের সর্প পূজা জায়গা পেয়ে এসেছে। তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলির মধ্যেই নানান চিত্র ও চরিত্র, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকায়ত জীবনকথা পাওয়া যায়। জীবনরসিক তারাশঙ্কর তাঁর সৃষ্টিতে রাঢ়দেশ বলতে বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীকে বুঝিয়েছেন। এই সব অঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনই লোকায়ত জীবনের সাথে যুক্ত। এদের মধ্যে সাঁওতালরাই প্রধান। বাংলার লোকসংস্কৃতি, লোকশিল্প, লোক উৎসব আদিম জাতি নির্ভর। তাই বাঙালির সংস্কৃতির পূর্ণতা লোকায়ত সংস্কৃতিকে নিয়েই। এই অঞ্চলে অসংখ্য দেব-দেবী ও মন্দির। মনসা, চণ্ডী, কালী, ধর্মঠাকুরের পুজো পাঠে বেশিরভাগ মানুষ মেতে থাকেন। শাক্তদেবীর পাশাপাশি বীরভূমের অনতিদূরে জয়দেব, প্রেমিক চণ্ডীদাস— সাধনভজন করেছেন। গাজন, ভাদু, টুসু, মেলার বৈচিত্র্যে রাঢ় অঞ্চলের জনজীবন প্রাণবন্ত থাকে। গল্পে ব্যবহৃত গান ছড়া লোকবিশ্বাস সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

'বাঞ্ছাপূরণ' গল্পের বহুবল্লভের প্রতিভা অসাধারণ। সে শ্যামা বিষয়ক, পদাবলী কিংবা দেহতত্ত্বের গান একতারা বাজিয়ে গায়। যেকোন গৃহস্থের দরজায় এসে গান ধরে বহুবল্লভ—

"আমার মনের রাধায় খুঁজে বেড়াই তিন ভুবনে।
রাধা আমার রইল কোথা, গোলক ধাঁধার কোন গোপনে!" [১]

বহুবল্লভ তার মনের মানুষের সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়ে গান গেয়েছে। ক্লান্ত অবসন্ন দেশে একটা গ্রামের প্রান্তে পুকুরের ঘাটে সে চোখ বন্ধ করে বসে একটু বিশ্রাম নেয়। মনের দুঃখে চোখের কোণ থেকে জলের ধারা নেমে আসে আর শুনতে পায় প্রিয়তমা রাধার কণ্ঠ মধুর গান—

"অবলায় দুখ দিলি রে নিঠুর কালিয়া—
ও নিঠুর কালিয়া—" (বাঞ্ছাপূরণ)

'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' গল্পে রাঢ়ের ধর্মীয় চর্চার উল্লেখে আখড়ার পরিচয় আছে। আখড়ার মালিক গোবিন্দ দাস। অজয়ের তীরে আখড়াটি আম জাম কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা। গোবিন্দ দাস দুপুরবেলা দাওয়ায় বসে শনের দড়ি পাকাতে পাকাতে আপন মনে গান ধরে—

"মধুর মধুর বংশী বাজে কদমতলে
কোথায় ললিতে—
কোন মহাজন পারে বলিতে ?
(আমি) পথের মাঝে পথ হারালেম
ব্রজে চলিতে,
কোন্ মহাজন পারে বলিতে ?
ও পোড়া মন, হায় পোড়া মন!
ভুল করিলি চোখ তুলিলি পথের ধূলা থেকে!
রাই যে আমার রাঙা পায়ে ছাপ গিয়েছে এঁকে
মনের ভুলে গলিপথে ঢুকলি রে তুই বেঁকে!

পোড়া মন পথ হারালি— পা বাড়ালি
(চন্দ্রাবলীর) কুঞ্জগলিতে।" [২]

কুৎসিতদর্শন গোবিন্দ দাস ভামিনীর প্রেমে পাগল। ভামিনী তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সে কামে ও প্রেমে বিচিত্র জীবনযাপনে অভ্যস্ত। বোষ্টম হয়েও সুদের কারবার আর সম্পদ ও সংযম দিয়ে প্রেমকে বাঁধতে চেয়েছে সে। অজয়ের তীরে আখড়ায় বসে আসন্ন সন্ধ্যায় সে গেয়ে ওঠে—

"সাধের কলস গলায় বেঁধে,
ডুব দিয়ে আর উঠব না;
যমুনায় কদমতলায়
ডুব দিয়ে আর উঠব না।
মন আগুনের জ্বালায় পুড়ে
খাক্ হয়ে আর ছুটব না।
নিধুবনে, মধুবনে, তমাল তলায় ছুটব না।
ও সাধের কলম গলায় বেঁধে—" [৩]

এই গানশুনে ভামিনী গোবিন্দের সামনে এসে একটি কলসি ভিক্ষে চেয়েছে। সে এখন কৃষ্ণদাসের আখড়ার কৃষ্ণভামিনী হলেও অভিমানিনী, গোবিন্দ দাসের প্রেমানুরাগিণী। তাই বলেছে মনের গোপন কথাটি—

"চন্দ্রাবলীর কুঞ্জবনে
নীল মাণিকের আলো জ্বলে;
রাধার কুঞ্জ আঁধার সেথা
রাধা ভাসে নয়নজলে।" [৪]

অভিমান প্রশমিত হয়ে প্রেমের প্রগাঢ়তা ক্রমশ বেড়েছে গোবিন্দ ও ভামিনীর মধ্যে। ষোলবছর সংসারত্যাগী হলেও ভামিনী সতী নারী। সে গোবিন্দ দাসকে ভালোবাসায় হারিয়ে দিয়েছে। তাই প্রেমের জয়ে সে সমর্পিত গোবিন্দ দাসের বাহুডোরে। এমনই আবেগঘন মুহূর্তে গোবিন্দ দাসের কণ্ঠে গান বসিয়েছেন লেখক—

"(হঠাৎ) গোলকধাঁধার বাইরে এলাম কোন পারে।
এপার ওপার নাই পারাবার গভীর অন্ধকারে।।
ও বৃন্দে সখী, ব'লে দে দিশে
কৃষ্ণ আমার কালী হল (আমি) পূজিব কিসে ?
চন্দন সিন্দুর হ'ল শ্মশান-বাসর ধারে
এলাম কোন পারে!" [৫]

'শিলাসন' গল্পের ব্রাহ্মণ বাবুমশায়কে নৃত্যপটীয়সী নারীদের গল্প শুনিয়েছে— 'রাজার অন্তঃপুর থেকে দারিদ্র্যের কুটির-অঙ্গন পর্যন্ত কুলঙ্গনারা রঙিন কাপড় পরে মাথার খোঁপায় গুচ্ছ গুচ্ছ গিরিমল্লিকা অর্থাৎ কুরচি ফুলের স্তবক পরে নৃত্যশিক্ষা করত।' আর বর্ষার সমাগমে নাচতে নাচতে গাইত আগমনীর গান—

"এস মেঘ বস মেঘ আমার ভু'য়ের শিয়রে
গলে নাম ভিজায়ে হে
টিলা খানা টিকরে
তোমার বরণ আমার কেশে—
যতন করে মাখি হে।" [৬]

'কমল মাঝির গল্প'-এর নায়ক কমল ছিল কালকেপুরের ডাঙ্গার সাঁওতালদের সমাজপতি। সে পঁচানব্বই বছর বয়সে মারা যেতে তার মৃত্যুর পর কাঁদবার লোক ছিল না, কেবল কয়েকজন অল্প বয়সী সাঁওতালরা ছাড়া। তারা গান গেয়ে কেঁদেছে। চিরকালের গান হিসেবে আদ্যিকালের প্রথা হিসেবে এঁরা গান গেয়ে কাঁদে—

" 'হায়রে-হায়রে! ছাতার উমূল তিঞ্ দ।'
তার মানে— হায়রে হায়রে-আমার ছাতার ছায়া! আমার
ছত্রছায়া আজ উড়ে গেল!
একজন কাঁদছিল— 'হায়রে হায়রে কু'ইডি মিরু তিঞ্ দ।'
অর্থাৎ হায়রে হায়রে আমার মহুয়া বনের টিয়া— আমার
মহুয়া বনের টিয়া আজ উড়ে গেল!" [৭]

এই গল্পে সাঁওতালী গান রয়েছে একটি—

"হায় হায় জলাপুরির
হায় হায় নুকিন মেনেয়া
হায় হায় বুসি আকান্কিন্
হায় হায় নুকিন মেনেয়া
অর্থাৎ—
হায় হায় দুঃখ সাগরে
হায় হায় এই মানব শিশু
হায় হায় জনম নিল যে
হায় হায় এই মানব শিশু" [৮]

তারাশঙ্কর কাহিনির বয়ানে কোন কোন গল্পের মাঝে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ব্যবহার করেছেন। যেমন 'হেডমাস্টার' গল্পে আছে—

"তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ— সুরের বাঁধনে—
তুমি জান না—
তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।।" [৯]

এই রীতির প্রয়োগ 'মানুষের মন' গল্পের মধ্যেও পাওয়া যায়—

"ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে
আগুন জ্বালো— আগুন জ্বালো!" [১০]

এই অনুবর্তন 'একটি প্রেমের গল্প'তেও দেখা যায়। 'শকুন্তলা' রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছে—

"কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ!" [১১]

ছোট্ট মেয়ে শকুন্তলার গান শেষ হতেই গল্পের কথক স্বয়ং লেখক সাঁওতালী সুরে মগ্ন হয়ে পড়েন—

"উপর কুলি— নামো কুলি মিলিন গা—
সিখানে সি জোড়া কদম গাছ।
কদম তলা যেয়ো না রে যেয়ো না—
তুমারো বিয়া হবে না!
তুমারো বিয়া চূড়া হবে না রে হবে না—
কদম্ব গাছে ফুল ফুটিছে!
কদম ফুলে হলুদ রঙে সাদা দাগ—
গায়ে লেগে বিয়া হবে না!" [১২]

'বিষ্টু চক্রবর্তীর কাহিনী' গল্পে রেলগাড়ির চালক বিষ্টুকে গান শুনিয়েছে—

'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম।
গাড়ি কাহে রুখ গিয়া হায় সীতারাম, কৃপা কর গাড়ি ছোড়
সীতাপতি রাম।
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম।" [১৩]

গল্পের মূল রস ও আবেদনের দিকে লক্ষ্য রেখে তারাশঙ্কর গল্পের বর্ণনা প্রসঙ্গে গানের ব্যবহার করেছেন। 'সাপুড়ের গল্প'তে রয়েছে গানের ব্যবহার—

"আয় চাঁদ আয় চাঁদ আয় চাঁদ—
আ-রে! আয় আয় আ-রে!
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা রে!" [১৪]

এটিকে গান না বলে আমরা ছড়াও বলতে পারি। কারণ এটি ছড়া থেকে সুরের আবেশ পেয়েছে। কালী, ভৈরবকে বিষ খাইয়েছে। প্রতিহিংসার পর পরম শান্তিতে শুয়ে আকাশের চাঁদ দেখে গানটি গেয়েছে।

'শেষ অভিনয়' গল্পের বাপ্পা বোস বিনোদিনীর অভিনয় দেখে চোখ ফেরাতে পারেনি। বাপ্পা বোসকে সে মধুর গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছে—

"হেসে নাও দুদিন বই তো নয়—
কে জানে কার কখন সন্ধ্যে হয়।
যৌবন বড় মধুময়।।" [১৫]

গানগুলির প্রয়োগে গল্পের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু গল্পের মূল রসের কোন বিঘ্ন ঘটেনি।

লৌকিক ছড়ার সমাবেশে গল্পগুলির গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ছড়া, পদ্য কিংবা স্তোত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গল্প কথনের সরলতা রক্ষিত হয়েছে বলা যায়। আর এধরনের বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে লেখকের বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়— 'সুকু ও ভুকু' গল্পে সুকুর কুকুরের নাম ভুকু। বিকেল বেলা সুকুর সাথে তার কুকুর ঘুরে বেড়ায়। এদিকে সুকুর জাঠতুতো বোন মিনি সুকুকে দেখতে পারে না। তাই দেওয়ালে ছড়া লিখে তার প্রতিক্রিয়া জানায়—

"সুকুর এবং ভুকুর—
মিলন দেখিয়া ঠাকুর—
হাসিছে খুকুর খুকুর।" [১৬]

এখানে ঠাকুর অর্থাৎ ঈশ্বর কেন যে হাসবেন তা মিনিও ভেবে পায় না। তার ছড়ায় তেমন বন্ধন নেই, নেই তেমন মিল। কিন্তু এই লেখা দেখেই সুকু চটে গিয়ে দেওয়াল মুছে দেয়। পরের দিন মিনি আবার নতুন ছড়া লিখেছে—

"ভিখিরী হলেন ভুকু—
চুকু-চুকু-চুকু—
ওরে নেড়ী কুত্তার হারাধন—
রইল রে তোর নিমন্ত্রণ—
বল দিকিনি কোথা ?
বাড়ির পিছে ময়লা গাদা যেথা।
ভুকু যাবে খেতে—
সুকু যাবে সাথে।" [১৭]

এবার সত্যিই সুকু রেগে যায়। সে জবাব দেওয়ার জন্য ছড়াটির পাশেই লিখে দেয়—

"পুলিশ কুকুর 'লাকি'
সুকুর কুকুর 'ভাকি'
সাবধান মাছ-চোখ— (মিনির নাম মিনাক্ষী)
চুরি করে খাচ্ছো কি
ভাকি গিয়ে ধরবে—

কাঁদলে— না ছাড়বে।

সাবধান— সাবধান

যাবে প্রাণ যাবে মান।" [১৮]

'মিনির নাম মিনাক্ষী' স্পষ্টতর করার উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ বাণী যেমন রয়েছে তেমনি অপমানের হাত থেকে কুকুরকে রক্ষা করতে ভুকু হয়েছে 'ভাকি'। অসাধারণ মেলবন্ধনে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে ছড়ার মাধ্যমে।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে বীরভূমের লোকসংস্কৃতির পরিচয় নিপুণভাবে চিত্রিত। লোকসংস্কৃতিতে জারিত মানব সমাজের জীবনাচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তাঁর সাহিত্য যথেষ্ট উজ্জ্বল। আঞ্চলিক বিশ্বাস অবিশ্বাসে গড়ে উঠেছে মানসিক পরিচিতি। 'বরমলাগের মাঠ' গল্পে ডাকিনী বিদ্যা, বান মারার প্রসঙ্গ জীবনাশ্রয়ী সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। 'ডাইনি' আর 'বরমলাগের মাঠ' গল্প দুটির মধ্যে কল্পনাগত সাযুজ্য পাওয়া যায়। দুটি গল্পেই কিংবদন্তী হিসেবে মাঠের কথা এসেছে। আর এসেছে মহানাগ ও ব্রহ্মনাগের কথা। 'ডাইনি' গল্পে রুক্ষ্ম ধূসর মাঠে একদা বাসা বেঁধেছিল মহানাগ। তার মহাপ্রস্থানের পরে তাই ঘাস গজায়নি। আর 'বরমলাগের মাঠ'-এ ব্রহ্মনাগের ভয়ানক বিষে ধূ ধূ করত মাঠ। তাই ঘাস গজাতো না। তবে নতুন গজানো দূর্বাঘাসের আস্তরণ ছাড়িয়ে টিলার মধ্যে বাস করত ব্রহ্মনাগ তথা 'বরমলাগ'— তাই সে মাঠে মানুষ পা দিলেই শেষ হয়ে যেত। এ কল্পনা তারাশঙ্করের। যা চরিত্রের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ মিথ হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য। আঞ্চলিক জীবনের রূপকার তারাশঙ্কর রাঢ়কে দেখেছেন, জেনেছেন বিস্তর ভাবেই। মাটি সংলগ্ন মানুষ তার সাহিত্যের গতি বৃদ্ধি করেছে। মানুষ বলতে শিক্ষিত সভ্য নয় পাল্কীবাহক কাহার, বেদে, বৈষ্টম, গুণীন, ছুতোর, ডোম, পটুয়া, বাজিকর, সদ্‌গোপ, ভল্লা-বাউরি সম্প্রদায় তাঁর গল্পে উপস্থিত। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় যেমন লোকসঙ্গীত আছে তেমনি 'কবি' উপন্যাসে বোলান, আলকাপ, ভাসানগান রয়েছে। আর আঞ্চলিক মেলার মধ্যে মানুষের মিলন ক্ষেত্র রচিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। গ্রাম দর্শনের আনন্দ নতুন নয় সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় ধরা রয়েছে নিজের বক্তব্যে—

> " 'শ্মশানঘাট' গল্পটির সূচনা কিন্তু বুলুর মৃত্যুর আগেই হয়েছিল। তখন আমি পিঠে বোঁচকা বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘুরি। কংগ্রেস ছেড়েছি, দেশোদ্ধার নয়, তবু ঘুরে বেড়াই। মেলা দেখি, গ্রাম দেখি, ঘুরি। পূর্ব জীবনের অভ্যাসটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। এই নেশাতেই বুলুর মৃত্যুর দিন পনেরো আগে গিয়েছিলাম উদ্ধারণপুরে।'' [১৯]

এই উদ্ধারণপুরে বাজারের কুম্ভকার, পালাকর্তা, মাদুর বুনিয়ে মেয়ে কুসুম, শ্মশানঘাটে পৈরুর শবদাহ প্রসঙ্গ গল্পের প্রথম অংশের জায়গা দখল করেছিল; কেবল আঞ্চলিক চেতনা ও উপলব্ধির জন্যই। ইংরেজি সাহিত্যে আঞ্চলিকতায় ঋদ্ধ স্টেইনবেক, জয়েস, ডিকেন্স প্রমুখদের মতো কথাশিল্পীদের তালিকায় বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তারাশঙ্করের নাম সার্থক রূপে বিবেচিত।

গুণময় মান্না

গুণময় মান্না তাঁর রচনায় বাস্তব জীবনের মধ্যে সমাজ সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। বিশ শতকের ছয়-সাত-আটের দশকে গ্রাম ও গ্রামের মানুষের সঙ্গে লেখকের নিরন্তর তথা আত্মিক যোগাযোগ ছিল। গ্রামের দরিদ্রতম মানুষের খবর যেমন তাঁর ছোটগল্পে রয়েছে, তেমনি— জমি, ধান-চাল, গো-পালন, গো-উৎসব, পশুচিকিৎসা, ওঝা-গুণিন, লোকপ্রবাদ, ছড়া সম্বন্ধেও তিনি লোকায়ত উপাদানের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

'সমস্যাপূরণ' গল্পের নিতাই বাগাল কেষ্টপুরের প্রমথ রায়ের ঘরে রাখালের কাজ করে পেট চালায়। তার খুব ইচ্ছে কলিমুদ্দি গুণিনের কাছে গুণিন বিদ্যা ও ও গরুর চিকিৎসাবিদ্যা শিখে নেবে। কেননা সে একদিন দেখেছে প্রমথ রায়ের লালী নামে অসুস্থ গরুটাকে কলিমুদ্দি চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলেছিল। সেই থেকে নিতাই পশু সেবায় মগ্ন হয়ে যায়।

'প্রবাসযাত্রী' গল্পে গো-উৎসব হিসেবে 'চাঁদ বাঁধান' হয়। কালীপুজোর পরদিন শেষ রাতে ভোর থেকে গ্রামে গ্রামে এই উৎসব পালিত হয়। গল্পের সারদা প্রতিবছর গোয়ালে ঢুকে এই অনুষ্ঠান করে—

> ''অনুষ্ঠানটি খুব ছোট। একটা ডালায় ধান দূর্বা পান সুপারি হলুদ পঞ্চদ্রব্য, প্রদীপ, একছড়া কলা— এই দিয়ে বরণ করা হয়; তার আগে গরুর শিঙে বনলতার মালা এবং বড় গাইয়ের জন্য একটা শোলার চাঁদমালাও পরিয়ে দেওয়া হয়।'' [২০]

লেখকের ভাবনায় এ অনুষ্ঠান আসলে বাঙালী মায়ের কন্যা বিদায় পর্বের মতো। 'মানুষের নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে গরু-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের বেশ সাদৃশ্য আছে। কারণ, মানুষের গরু, আবার উল্টে বলা যায়, গরুরই মানুষ।'—এভাবে গরুর প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন লেখক।

'সমস্যাপূরণ' গল্পে দেখা যায় গ্রাম্যজীবনে পারিবারিক মঙ্গলকামনার জন্য 'হরিলুঠের বাতাসা' বিতরণের প্রসঙ্গ। আবার 'ব্লাডপ্রেসার' গল্পে মেদিনীপুরের ঘাটাল সংলগ্ন নিমতলা অঞ্চলে সকালে বিকালে 'বেড়া-কীর্তনের দল' গ্রাম পরিভ্রমণ করে। গ্রামের মানুষের কল্যাণার্থে এই ধরনের অনুষ্ঠান খুবই প্রচলিত।

লোকউৎসব হিসেবে গ্রামের মেলা পার্বণই লোকসমাজের একমাত্র মিলনক্ষেত্র। দেবীপুরের শ্রীপঞ্চমীর মেলায় নিতাই ও তার বউ ছেঁপী নানান জিনিস কিনে খায় ও আনন্দে মেতে ওঠে—

> ''খুব বড় মেলা। দোকান-পাট, কত মনোহারী জিনিস, নাগরদোলা, ছেঁপী আর নিতাই, বুড়োবুড়িতে এইসব দেখে শুনে বেড়াতে লাগল।'' (সমস্যাপূরণ)

'পরিণীতা' গল্পে লোকপ্রচার রয়েছে যে— 'জনৈক ওলন্দাজ কুঠিয়ালের নামে বাবরশা নামিত মিষ্টান্নের চলন হয়েছিল— যদিও ক্ষীরপাই তার মূল প্রাপ্তিস্থান, হালদার দীঘি রাধানগর খড়ার প্রভৃতি স্থানেও তা ছড়িয়ে পড়েছিল।' আজও ঐ সমস্ত অঞ্চলে বাবরশা মিষ্টান্নের প্রচলন রয়েছে। বাঙালিদের কাছে এই মিষ্টান্ন খুবই জনপ্রিয়। সে আমলে চন্দ্রকোণা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র। লোককথা রয়েছে— 'চন্দ্রকোণায় বাহান্ন বাজার তিপান্ন গলি।' তাছাড়া লোকশিল্প হিসেবে রামজীবনপুরের তাঁতের শাড়ি, পিতলের বাসন পাওয়া যেত। আর খড়ারে প্রসিদ্ধ কাঁসার বাসন— কারুশিল্প ও চারুশিল্পের জন্য অঞ্চলটির সুনাম রয়েছে।

'প্রসব' গল্পে রয়েছে নানা লোকাচারের প্রসঙ্গ। যেমন— 'ছেলের ষষ্ঠীপুজোর দিন লোকে খই-মোয়া খায়।' এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সদ্য মা হওয়া বিনতা নানা আচার পালন করেছে। 'নখ কেটেছে, তেল-হলুদ মেখে ধান দূর্বা মেশানো জলে স্নান করেছে। আর এসব করিয়েছে উপস্থিত প্রবীণা মেয়েরা। ষষ্ঠী পূজোয় মা ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে সুর করে দুলে দুলে ছড়া বলেছে ভোলার মা—

'মা ষষ্ঠী, তুমার বালক এল বনে
থাকে যেন মনে,
শত্রু দুশমন চাপা দিয়ে রাখে গোড়ের কোণে।
দোহাই মা ষষ্ঠীর, দোহাই মা ষষ্ঠীর।।' [২১]

তখন সমবেত মহিলারা শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দিয়ে প্রণাম জানায়। গুণময় মান্নার গল্পের বয়ানে প্রবাদের ব্যবহার খুবই কম। তারই মধ্যে চোখে পড়ে— 'জোয়ানের বোঁটা আর বুড়োদের খোঁটা' ('সমস্যাপূরণ')

মহাশ্বেতা দেবী

'লোকবৃত্ত থেকে সংগৃহীত উপাদানকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি।' মহাশ্বেতা দেবীর এই শ্রদ্ধার পরিচয় রয়েছে সাহিত্যের পাতায়, গল্পের আবেষ্টনীতে। লৌকিক উপাদানের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ছড়া, গান, প্রবাদের সাথে লোকবিদ্যা, জাতিভেদ প্রথা, লোকমন্ত্র, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ইত্যাদি প্রসঙ্গ গ্রথিত রয়েছে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত— এই সত্যতার পরিচয় মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের মধ্যে পাওয়া যাবে।

'বাঁয়েন' গল্পে লোককথার অন্তরালে লোকবিশ্বাস স্থায়ী হয়েছে। 'বাঁয়েন' বলতে নিষ্ঠুর নির্দয় শিশুহন্তা, কিংবা লৌকিক বিশ্বাস যে, যে নারী মরা ছেলেকে দুধ খাওয়ায়, সোহাগ করে। অবশ্য সমাজের এক শ্রেণির মানুষের মিথ্যা রটনায়, সন্দেহে ও অপবাদে চণ্ডীর মতো ভালো মেয়েকে বাঁয়েন হতে হয়। যার স্বামী মলিন্দর ও ছেলে ভগীরথ গঙ্গাপুত্র। কুসংস্কারে অন্ধ মানুষগুলির সেবার জন্য পাঁচ বছরের নীচে মৃত শিশুদের শ্মশানে কবর দিত চণ্ডী। এই কাজ সে পিতার কাছ থেকে পায়। তার সন্তান থাকলেও তাকে সমাজচ্যুত হতে হয় বাঁয়েন অপবাদ দিয়ে তাকে গাঁ ছাড়া করায়। কেননা ডাইনি হলে পুড়িয়ে মারার প্রথা থাকলেও বাঁয়েনকে একাকী জীবনযাপন করতে হয়— এটাই চিরকালের প্রথা। এই গল্পে একটি ঘুমপাড়ানি গান রয়েছে— 'ঘুম এস ঘুম এস রে সোনা, ঘুম এস রে যাদু'।

'টোটকা' গল্পে লোক ঔষধের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন— ছোটছেলের পেট ছাড়লে (পাতলা পায়খানা হলে) টোটকা জানা নিত্যচরণ বলেছে— 'গোটা হলুদ বেটে চিনি দিয়ে জল খাইয়ে দেকুন কয়েক বার।' তাছাড়া হাড়ভাঙা লতা, শিউলির মূল, শেয়ালকাঁটার বীজ, যজ্ঞডুমুরের মূলের ছাল— এসব টোটকা চিকিৎসায় ব্যবহার্য উপকরণ।

'বিছন' গল্পে স্বজন হারানোর যন্ত্রণায় লোকগানের পরিচয় পাওয়া যায়। ধাতুয়া গেয়ে ওঠে—

> "কোথা গেল করণ ?
> বুলাকি কোথায়
> কেউ তাদের খোঁজ দেয় না কেন ?
> তারা পুলিশের খাতায় হারিয়ে গেছে।" [২২]

আবার 'হুলমাহার মা' গল্পে দুঃখময় লৌকিক জীবন কথা গানের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

> "হায়রে! কাশ ফুল ফুটেছিল
> মেয়ে জন্মেছিল

হায়রে। পলাশ ফুল ফুটেছিল
ছেলে জন্মেছিল।" [২৩]

এ গান হৃদয়বিদারক— সন্তানের জন্য গভীর ভালোবাসার ও শ্রদ্ধার। এই সন্তানের দুঃখে বনের পাখি কাঁদে, বাঘ মাথা নামিয়ে পথ ছেড়ে দেয়, সাপ ফণা নামায়।

'উর্বশী ও জনি' গল্পে বাজিকর জীবনের পেশা ও সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে। গল্পে কানী মোতি জনিকে চিরদিনের মতো কাছে পেতে চায়। এই তার স্বপ্ন। এদিকে জনি উর্বশীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অনুরাগে, ক্রোধে বিষণ্ণতায় কানী মোতির বুকচেরা কান্না বিস্বরে গানের মধ্যদিয়ে বেরিয়ে এসেছে—

'চাঁদের আলোর সমান
রূপসী ছিলাম
তোমাদেরি সমান রঙে গো!
বাড়িতে পরিতাম
বেনারসী শাড়ি
দোরেতে দাঁড়াত
কত জুড়ি গাড়ি
বাবুরা আসিয়ে
কত ভালবাসিয়ে
চাঁদমণি বলে
ডাকিত গো!' [২৪]

মোতির এই গান পরাজিত ব্যর্থ-মনের হাহাকার। গল্পে আর একটি গান উর্বশীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

''চলতে-চলতে আল্‌বিদা মত্
বোলোঁ!
'ঝিলিমিলি কাচের চুড়ি
সোহাগ রাণি গো!'
'ডো রে মি!'' [২৫]

উর্বশী চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয় এই গানে। উর্বশীর গলা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে শেষ গান হিসেবে এই গানটি প্রধান চরিত্রের অসহায়তা সহ গল্পের চূড়ান্ত পরিণতির প্রেক্ষিতটি উন্মোচিত করে। তাই নামটি বিশেষ তাৎ পর্যবাহী।

'কারণ ছিল' গল্পে অকৃতদার ভরতবাবুর উপযুক্ত চাকর ভোলানাথের ফন্দিফিকির, বদ অভ্যাস প্রসঙ্গে মিস শেফালী বসুর কণ্ঠে গানটি গল্পের বাতাবরণ রচনার পক্ষে যথেষ্ট মানানসই হয়েছে—

''আয়লো অলি আয়লো কুসুম
বাবুর বাগানে—'

‘ও তুই কাঁদলি কেন বল, ও তুই
কাঁদলি কেন বল্,
ও ভোর সকাল থেকে রাত অবধি,
ফুল কুড়োবার ছল।’
এবং অচিন দেশের নচিন প্রিয়া
সকাল হলেই কাঁদে—’’ [২৬]

‘স্তনদায়িনী’ গল্পে হালদার বাড়ির কচি কাঁচাদের ‘দুধ-মা’ হিসেবে যশোদাকে রাখা হয়। অর্থাৎ সে প্রফেশ্যনাল মা এবং স্বামী কাঙালিচরণ পেশাদারি পিতা হিসেবে স্বীকৃত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই প্রেক্ষিতে একটি গানের সমাবেশ ঘটিয়েছেন গল্পকার, যা চিরন্তন সত্য—

‘মা হওয়া কি মুখের কথা ?
শুধু প্রসব কল্লে হয় না মাতা।’ [২৭]

বাঙালির লৌকিক জীবনে বেশ কিছু রীতি নীতি রয়েছে অপদেবতার হাত থেকে কিংবা অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচতে মানুষ বিশ্বাস করে। অন্ত্যজ সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যা ও জাতপাতের ভেদাভেদের জন্য বেশ কিছু প্রথা বদ্ধমূল বিশ্বাসে মান্যতা পায়। মহাশ্বেতা দেবীর ‘তরাস’ গল্পে প্রাচীন প্রথা রয়েছে। যা কুসংস্কাররূপে পরিচিত। অলৌকিক অশরীরী আত্মাদের উদ্দেশ্যে তরাস মাঠের মধ্যে রেখে আসতে হয়। এই তরাস আসলে শ্রাদ্ধের খাদ্য সামগ্রী। শ্রাদ্ধের নিয়ম হিসেবে ‘তরাস’ মঙ্গলজনক। লোকবিশ্বাসের কারণে এর প্রচলন দেখা যায়। তেমনি ‘ডাইনি’ গল্পে রয়েছে একটি প্রাচীন কুসংস্কার, ‘সাঁঝ সকালের মা’ গল্পে ‘বাণমারা’ ও ভর-এর প্রসঙ্গ আছে। রয়েছে ‘পাখমারা’ উপজাতির পরিচয়। যারা শ্মশানের কলসিতে জল খায়, সাপ ধরে। হিজলী-কাঁথি-তমলুকে এদের বসবাস হলেও এরা যাযাবর। ‘জটেশ্বরীর’ ওপর দেবতার ভর-এর প্রসঙ্গে জানা যায় অধিদৈবিক প্রসঙ্গ রাঢ় অঞ্চলের মানুষের লৌকিক জীবনের ভরকেন্দ্রে ছিল।

‘সমাজবাদ বাবুয়া’ গল্পে বাঁধন পরবের পরিচয় আছে। এটি সাঁওতালদের একটি অন্যতম উৎসব। বিভিন্ন গল্প পাঠে দেখা যায় মহাশ্বেতা দেবীর গল্প লৌকিক উপাদানের নিঁখুত সমাবেশে লোকজীবনের প্রকৃতি স্বরূপ, তথা বৈশিষ্ট্যকে উন্মোচিত করেছে।

ভগীরথ মিশ্র

একই ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে যখন বিপুল পরিমাণ মানুষ সংহত হয়ে তাদের জীবনযাত্রা, ভাষা, জীবিকা, আচার-আচরণ অর্থাৎ জীবনচর্যার সামগ্রিক রূপ পরিগ্রহ করে তখন লোকপরম্পরায় ঐতিহ্য অনুসৃত হয়। লেখকের বাহ্যিক দৃষ্টির অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে নানান রূপে-রঙে-রসে সাহিত্যিক রসের আকারে প্রকাশ পায়। তারপর তা সকল হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশলে লেখকের বেঁচে থাকা, সাহিত্যের উৎকর্ষতা সাধনের বিচার্য বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হওয়া। সাহিত্যের পাতায় সমাজ জীবনের প্রত্যক্ষ ছবি প্রতিফলিত হয়। আসলে এই সংহত সমাজ জীবনে একজন সাহিত্যিক সত্যদ্রষ্টা। যুগোপযোগী লেখক শিল্পীরা তাঁদের শিল্পমাধ্যমকে তুলে ধরার প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। ফলে, একজন সাহিত্যিক সমাজের নানান সমস্যার সাথে প্রচলিত জীবনচর্যাকে তুলে ধরেন।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের গ্রাম্য জীবনকথাকে সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেছেন অনেক সাহিত্যিক। যেখানে অভাব ও দারিদ্র্যের সাথে নানান সমস্যার কথা উঠে এসেছে। গল্পকার ভগীরথ মিশ্র গ্রাম্য জীবনের ছবি যেমন এঁকেছেন তথা নিখুঁত জীবন চিত্রকে সত্য বলে যেমন মর্যাদা দিয়েছেন, তেমনি দুঃখময় জীবনের দিন যাপনের কথা যেমন প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে তেমনি লোকসমাজ নির্ভর মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনকথার প্রতিফলন দেখা যায় লোকবিশ্বাস-সংস্কার, ছড়া-লোকগান, প্রবাদ ইত্যাদি লোকঐতিহ্য নির্ভরতায়।

ছড়ার ব্যবহার সাধারণত লোকসমাজে নারী ও শিশুর মধ্যে পাওয়া যায়। বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির এই ধারা শিষ্ট সমাজে তেমন প্রচলন নয় বললেই চলে। ভগীরথ মিশ্রের 'সুবচনী' গল্পের 'সুবচনী' ছড়া কাটার ওস্তাদী মেয়ে। লেখকের কথায়—

> "কখনো-সখনো এক-আধ ঘন্টা গলা সাধত, দলের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে। তবে সর্বদা মেজো- খুড়ীর দলেই থাকত সে। ধীরে ধীরে প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটতে লাগল সুবচনীর। অনেক চোখা-চোখা নতুন জাতের খেউড় উপহার দিতে লাগল সে। আর, যেটা বাউরিপাড়ার অন্যদের মধ্যে, এমনকি রাধা-খুড়ী এবং এলোকেশীর মধ্যেও বিরল ছিল, সুবচনী সেই ছড়া কেটে কেটে খেউড় করতে শিখল। শোলক, প্রবচন, ছড়া— এসব অবশ্যি খেউড় লড়াইয়ের অঙ্গ। এগুলো ছাড়া খেউড় জমে না। কিন্তু সুবচনীর মতো অমন কথায় কথায় ছড়া কাটা— সে ছিল একেবারে তাক লাগিয়ে দেবার মতো।" [২৮]

লোকসমাজে সুবচনীর মতো নারীরা খেউড়ে নারী হলেও গল্পকার দেখিয়েছেন এইসব নারীর মধ্যে গুণপনার পরিচয়। সমাজের একশ্রেণীর লোক এই সব নারীদের সাহায্যে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছে। আর খেউড়ে সুবচনী সামান্য উপার্জনের আশায় কখনো ছড়া কেটে খেউড় দিয়েছে। আবার কখনো গানের মধ্যে যেন সরস্বতীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সুবচনীর ছড়ার ধরণ তুলে ধরেছেন লেখক ভগীরথ মিশ্র—

১. 'অরে খালমুয়ী
মর্ মর্ তুই।' [২৯]

২. 'অরে হারামজাদী
তুয়ার মুখে পাদি।' [৩০]

৩. 'অরে ড্যাকরা, মুখ পুড়া
তুয়ার মুখে জ্বাইল্ব লুড়া।' [৩১]

সুবচনীর কণ্ঠে এমন পদে পদে, ছত্রে ছত্রে ছড়া কাটা শুনে গ্রামের মানুষ মোহিত হয়ে যেত। প্রতিপক্ষ হঠাৎ করে গুছিয়ে বা বানিয়ে নতুন ছড়া যোগাতে পারত না। প্রতিপক্ষের হার হত। আর ঠিক এই সুযোগে ধীরে ধীরে লৌকিক ছড়ার ছন্দ ছেড়ে সে পয়ার ছন্দে ছড়া বেঁধে ফেলত—

"খালমুয়ী। ভাতার খাকী দিস নাই ক লাফ।
আমার বাপ ত ভালা মানুষ, (তুয়ার) বেধা বাপকে ডাক্।" [৩২]

সুবচনীর কণ্ঠে এমন ছড়া শুনে শ্রোতারা তারিফ করত। এমনকি শত্রু-শিবিরও মনে মনে তারিফ না করে ছাড়ে না। আর এদিকে সুবচনীর ছড়ায় মুগ্ধ জনতার ভাবভঙ্গী দেখে সুবচনীও আনন্দ নিতে থাকে। গল্পকার ভগীরথ মিশ্র সুবচনীর কণ্ঠে কেবল পয়ার ছন্দের ছড়া বাঁধেননি। সুবচনী ত্রিপদীর বন্ধনে ছড়া আউড়ে আনন্দ পেয়েছে—

১. "অরে মুখ পুড়ী, আমার মাইজো খুড়ী
হাগল্যে কাঁকরা পিঠা—
খেইয়োঁ দেখিস তরা, অরে খালভরা
সিট্যা কত লাগে মিঠ্য—" [৩৩]

২. "অরে ম্যাদ্য-হাতি তুয়ার মুখে লাথি
মর্ তুই পুইড়্যে আগুনে—
অরে খালমুয়ী, মর মর তুই
খাক তুয়াকে শ্যাল-শাগুনে।" [৩৪]

এরূপ ছড়া যেমন জীবন্ত, তেমনি লোকসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে ছড়ার ভাষায় তার প্রমাণ রয়েছে।

ভগীরথ মিশ্রের বেশ কয়েকটি গল্পে লোকসঙ্গীতের পরিচয় উঠে এসেছে। ১৯৯২ সালে 'প্রমা'তে

প্রকাশিত 'সুবচনী নামক গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'সুবচনী' নামকরণের সাথে চরিত্রটি যথেষ্ট ব্যঞ্জনাদীপ্ত ভাবে নির্মাণ করেছেন ভগীরথ মিশ্র। যার গলা দিয়ে খেউড়, বাখান ছাড়া অন্য কিছু বের হত না, পৌঢ়া বয়সে এসে সেই নারীর স্মৃতিপটে অতীতচারিতায় ধরা পড়ছে কচি বয়সে লোকগানের কথা, ভেসে এসেছে বারবার। তাইতো বাবার হাত ধরে গ্রামের পালাগানের আসরে সে শুনতে যেতো 'রামায়ণের সীতাহরণ', অশোক বনে সীতা', গুহক চন্ডালের গল্প, 'কৃষ্ণলীলার মাথুর পর্বের কথা'। 'অশোক বনে সীতা' পালা পর্বে সীতার দুঃখময় জীবন কথায় সুবচনীর চোখের জল বাগ মানত না। তাছাড়া সীতা ও রাধিকার দুঃখে চোখ ফেটে জল আসত সুবচনীর। এমন সব পালাগান যা তাকে মুগ্ধ করে রাখত। 'অশোকবনে সীতা' নামক পালাগানের পদগুলি হল—

"অশোকের বনে সীতা কান্দে গড়াগড়ি
চারিপাশে হাস্য করে রাবণের চেড়ী।" [৩৫]

আবার সীতাকে রাবণ হরণ করলে সীতা অলঙ্কার খুলে ফেলে দিয়েছে। পথচিহ্ন হিসেবে এরূপ পদ—

"শূন্য পথে সীতাদেবী কাঁদে, হায় হায়
অঙ্গের গহনা যত ধূলিতে ছড়ায়।" [৩৬]

পথশ্রমে ক্লান্ত রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে যাবার পথে গুহক চন্ডালের কুটিরে উপস্থিত হওয়ার কাহিনী নিয়ে রয়েছে লোকসঙ্গীত—

"রাম নামানন্দে গুহক কিছুই না জানে
পুলকে ভরিল দেহ, ধারা দু'লয়নে।"[৩৭]

গল্পকার রাসলীলা, কালীয় দমন, মাথুর-এর মতো চমৎকার পদের প্রসঙ্গ সূত্রে গল্পের কাহিনী সাজিয়েছেন। কৃষ্ণলীলার মাথুর পর্বের কাহিনীকে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন 'সুবচনী'-র অকথিত ভাবনায়। আর কথক ঠাকুরের মধুর আলাপ যেন চিরমধুমাখা বাক্যালাপ। গল্পকার এমনই এক বাক্যালাপের পরিচয় দিয়েছেন—

"মথুরায় রাজা হয়েছেন ব্রজের রাখাল। শ্রীরাধিকার কথা ভুলেছেন তিনি। প্রিয় সখী বৃন্দা, দূত হয়ে এসেছে মধুরার প্রাসাদে। সে বয়ে এনেছে শ্রীমতীর ব্যাকুল বার্তা। কিন্তু মথুরাপুরীর দ্বাররক্ষী তাকে কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছে না অন্দরে। কেঁদে ওঠেন বৃন্দা-দূতী। বলেন—

যমুনা পুলিনে বহে আঁখি ধারা শ্রীমতীর নিশিদিন।
তুমি শ্যামরায় হেথা মথুরায় সুখেতে বিতাও দিন।" [৩৮]

কিংবা সুচবনীর ভেতরে গুনগুনিয়ে ওঠে সুর ও কথা—

"দ্বার ছেইড়ে দে'রে দ্বারী
ভিত্‌রে আছেন শ্যাম-মুরারী
দ্বার ছেইড়ে দে'রে দ্বারী...।" [৩৯]

এ গান যেন জীবনভেদী, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে হৃদয়কে দুমড়ে মুচড়ে দেয়। অদৃশ্য দ্বারীর উদ্দেশ্যে আকুলিত হয় হৃদয় মন।

'দৃষ্টি' গল্পে ভগীরথ মিত্র ঝড়েশ্বর লুহারের মধ্য দিয়ে রাঢ় অঞ্চলের মানুষের লোকবিশ্বাসকে জাগ্রত করেছেন। ঝড়েশ্বর লুহার গুণিনবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি। কিন্তু পঞ্চায়েত থেকে ফরমান করে ওঝাগিরি বন্ধ করার ফলে ঝড়েশ্বরের ক্রোধ বেড়ে যায়। সে বলে— "পঞ্চাৎ তুমি, পঞ্চায়েতের মতো থাক। ঝড়েশ্বর লুহারের পাছায় আছোলা দিবার দরকারটা কি তুমার।" কিন্তু ভুল চিকিৎসায় রুগী মারা যেতে পারত এই কথা তার বউ লৈতনের মুখে পাওয়া গেছে—

> "তুমি টি.বি. রুগী চিনলে নাই। বইলে দিলে, কোউ খাচ্ছে! তুরন্ত হস্‌পিডালে না দিলে, ছগরা বাঁইচ্‌ত ? অঝাগিরি যে কচ্ছিলে, উ মইরলে, তুমি উয়ার দায়ী হইত্তে ?" (দৃষ্টি)

এই ঝড়েশ্বর আবার দিনে দুপুরে আকণ্ঠ মদ গিলে 'মনসার গান' ধরে। এমনই সব লোকসংস্কৃতির পরিচয় পাই 'ইন্দর যাগ' নামক গল্পে। বিশ্বাস-অবিশ্বাস মিলিয়ে মানুষের বেঁচে থাকাটা যেমন চিরন্তন সংশয় ও সংকটের তেমনি এইসব লৌকিক সংস্কৃতিকে মানুষ এড়িয়ে চলতে পারেন না। আলোচ্য গল্পের বয়ানে সাতপাট্টি-মন্ডল কুলি গাঁয়ের ঘরে ঘরে সবাই কুহকবিদ্যা জানে। এই বিদ্যার বিশ্বাসযোগ্যতার পরিচয় তুলে ধরেছেন গল্পকার—

> "সিখ্যেন উস্তাদরা তারাফিনি নদীর জলের উপরে পায়ে হেঁট্যে পারাপার হয়। সিখ্যেনে একটা মই আর একটা আগুনের বুঁদি উড়িয়ে উড়িয়ে সারা গাঁয়ের চাষা ব্যাভার করে ক্ষেতে।" (ইন্দর যাগ)

এই কুহকবিদ্যার ক্ষমতা সম্পর্কে গাঁয়ের লোকজন নিজেদের মধ্যে তর্কে মেতে ওঠে। লেখকের কথায় উঠে এসেছে মানুষের দীর্ঘকালীন বিশ্বাসের ছবি। লখিন্দরের মতো চরিত্র নানান বিদ্যায় কিভাবে নিজেকে বিজ্ঞ ভেবেছে লোককথায় তা উঠে এসেছে—

> "উসব লোগ কি নাই পারে ? মরাইয়ের ধান উড়ায়। পোক্‌রের মাছ উড়ায়। গাইয়ের বাঁটের দুধ উড়ায়। বাণ মেরে মুখে রক্ত তুলে। মারণ-তাড়ন-সম্মোহন-উচাটন-কুন্ বিদ্যাটা উয়াদ্যার অজানা ?" (ঐ)

আবার সাপে কামড়ালে এই ওঝাগিরিতে রোগ সেরে যাওয়ার পদ্ধতির কথা বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন—

> "সাপে কেইটেছে ? হাতে একখান কড়ি লিয়ে তিনবার ফুঁ দিয়ে ফাবড়াই দিব্যেক্ ওঝা ঈশান কোণে। খানিকবাদে সাপ সুড়সুড় কইর‍্যেঁ হাজির হব্যেক অঝার পাশ। মাথায় জোঁকের মতোন টেইস্যে বইস্যে খাইক্‌ব্যেক কড়ি।" (ঐ)

এইভাবে লোকবিশ্বাসকে গল্পকার তাঁর গল্পের আধারে তুলে ধরেছেন যা চিরন্তন সত্য ও আবেদনীয়। এমন লোকবিশ্বাসের আরও পরিচয় রয়েছে 'ইন্দর যাগ' গল্পের মধ্যেই। যেমন যুবতী মানুষকে বশ

করার জন্য নিয়ম হল—

> "মন্তরপড়া লাল জবা ফুল আলতো শুঁকে উই মেয়াকে দেখান পরপর তিনদিন, উমেয়া তখন ঠিক ফেতি কুত্তার মতোন ঘুরব্যেক আপনার পিছেন পিছে।" (ইন্দর যাগ)

এমনকি সতীনকে বশ করার জন্য লখিন্দরের মন্ত্রের জবাব নেই। খান্ডার সতীন দিনভর ঝগড়া করলে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য উপায় হল—

> "বাণপর্ণী গাছের পাতা ছেঁচে দধি ও জলের সাথে মিশিয়ে, মন্তর পড়ে, সতীনের শয়ন স্থানের উপরে ও নীচে ছিটিয়ে দিন। সতীন তখন ঠিক য্যান মায়ের পেটের বোনটি।" (ঐ)

মন্ত্রশক্তিতে গাছচালার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে 'ইন্দর যাগ' গল্পের মধ্যে। কুম্ভস্থলীর দশরথ পছালি নামকরা গুণিন। গুণিনের গুণপনা ও আদব-কায়দা সম্পর্কে ভগীরথ মিশ্র-এর কথনে উঠে এসেছে গ্রামীণ জীবনে লোকবিশ্বাসের পরিচয়—

> "কুম্ভস্থলীতে এখনো একটা বিশাল গাছ রয়েছে। আজতক ওটার জাত চিনতে পারেনি কেউ। কী করে পারব্যেক ? সে কি এ দেশের গাছ ? দশরথ পছালি কাউর-কামাখ্যা থেকে উড়িয়ে এনেছিল সে গাছ। উই গাছে চড়ে পছালি নাকি বিশ্বভুবন ঘুরে বেড়াত রাতোভিতে। ভোরের আগে আবার যেখানকার গাছ সেখানে। ক্ষমতা ছিল লোকটার। শুধু চরিত্র দোষে লষ্ট লইয্যেঁ গেল। ...গাছে চড়ে যিখনে্ খুশি চইলো যেত গহীন রাতে। উঠানে গাছ খাড়া রেইখ্যে মাছি হইয়্যেঁ সেঁধাতো যে কোনো যোবতী মেয়ার ঘরে। মন্ত্র বলে লিদ্রায় অচেতন কইর‍্যে দিতো সক্কলকে। সহবাস অন্তে গাছে চইড়্যে ফিরে আঁইত শেষ পহরে।" (ইন্দর যাগ)

গল্পকার লখিন্দরের গুণিন বিদ্যার পরিচয় তুলে ধরেছেন গল্পের মধ্যে। সে দিন রাত শ্মশানে-মশানে থাকত। গাঁজা-ভাঙ খেত। সাপ-খোপ ধরত। এমনকি মাদুলি-কবচও দিত। ভাদ্রমাসে বিষ্টুপুরের দরবারে মনসার ঝাঁপানে গুণিনদের মধ্যমণি হয়ে যায় লখিন্দর। লেখকের কথা—

> "লখিন্দর ওঝা মধ্যমণিটি হয়ে দাঁড়ায়। দু'কান কামড়ে ঝুলতে থাকে একজোড়া দুধিয়া খরিশ। জিভ কামড়ে ঝুলে থাকে উদয়লাগ। লখিন্দরকে নিয়ে তখন সারা তল্লাটে সব হাড় কাঁপানো গল্প।" [৪০]

তবে গুণিনি বিদ্যা ছাড়াও 'তেলপড়া', 'জলপড়া', 'বাণমারা', ভূত ছাড়ানোর প্রসঙ্গ নানান গল্পের অবয়বে স্থান পেয়েছে। 'ইন্দরযাগ' গল্পের নামকরণের মধ্যেই রয়েছে পৌরাণিকতার আভাস। ইন্দ্রযজ্ঞের শেষ দিনে বৃষ্টি নামার প্রত্যাশায় গ্রামের মানুষ যজ্ঞের সমস্ত খরচ দিতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু ভৈরব গাঙ্গুলির প্রশ্ন ছিল লখিন্দরকে— "তুয়ার বিদ্যায় সত্যি বরষা লামব্যেক ?" আসলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোটানায় গোটা গল্পের কাহিনী বয়ানে গল্পকার সাধারণ মানুষগুলির মনোভাবকে সচলতা দিতে পেরেছেন।

‘কদম ডালির সাধু’ গল্পের মধ্যে প্রসঙ্গসূত্রে উঠে এসে লোককথার অন্যতম প্রবাদ—

১. ‘চোরের আবার মেয়ে— দাদুভাই।’ [৪১]

২. ‘বারাঙ্গনার আবার ফুলশয্যা।’ [৪২]

৩. ‘সব কাঁটাই রক্ত ঝরায়, চোর কাঁটারে গালি।’ [৪৩]

কারণ সাধুর তিন কুলে কেউ ছিল না, একমাত্র মামা শশী গুচ্ছাইত ছাড়া। সাধুকে সে বলেছে—

> “তোর একমাত্র পরিচয়, তুই চোর। চোরের বউ, ছেলে কেউ হতে চায় না, বাপ আমার।” [৪৪]

তাছাড়া এই গল্পে লোকবিশ্বাসের পরিচয় তুলে ধরেছেন গল্পকার—

১. ‘বাঁশ গাছে ফুল ধরলে নাকি দুর্ভিক্ষ হয়।’ [৪৫]

২. ‘সারা কোমরে বাত। অমাবস্যা পূর্ণিমাতে আরও চাগিয়ে ওঠে।’ [৪৬]

অমর মিত্র

লোকসংস্কৃতির মধ্যে লোকসাহিত্য একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যে দেশ-কাল সমাজে মানুষের জীবনাচরণের মধ্যে প্রকাশমান থাকে। সমাজ জীবনের নানা অনুষঙ্গ লোকজীবন নির্ভর। লৌকিক উপাদানগুলি সাহিত্যের পাতায় ঐতিহ্যানুসারে প্রতিফলিত হয়। মৌখিক সাহিত্যের পরিচয় লোকসাহিত্যের মধ্যেই রয়েছে। অমর মিত্রের ছোটগল্পের মধ্যে লৌকিক উপাদানের ব্যবহার তাঁর গ্রামীণ জীবন অভিজ্ঞতার পরিচয়বাহী। রাঢ় অঞ্চলের লোকায়ত মানুষের সুখ-দুঃখের বর্ণনায় লোকজ উপাদান ব্যবহার করে তাঁর রচনার কৃৎকৌশলকে অনন্যতা দান করেছেন লেখক অমর মিত্র। গল্পের মধ্যেই যেন লৌকিক ঐতিহ্য চিরকালীন হয়ে রয়েছে। 'মাঠভাঙে কালপুরুষ' গল্পের রূপাই অসহায়তা ও সর্বহারা থেকে প্রতিবাদমুখর হয়েছে। কিন্তু সে বাবুর টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে পথে হাঁটতে হাঁটতে শোনে ধামসার বাজনা—

> "হেই শালা আজ সংকরান্তি! মনা ছিলনি, সি জন্যিই ত ধামসা বাজে বটে। কাঁসাই নদীতে টুসু ভাসে।" [৪৭]

এই 'টুসু' গানের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রাণশক্তির সহজ প্রকাশ ঘটে। আসলে কৃষিজীবী সমাজে শস্যকে কেন্দ্র করে যে সব উৎসব হয় টুসু সেগুলির মধ্যে প্রাচীন। রাঢ়ের নানা অঞ্চলে টুসুগান এক এক নামে ও রূপে কথা ও সুরের সমন্বয়ে গাওয়া হয়। কোরা, লোধা, মুন্ডা, সাঁওতাল সকলেই এই উৎসবে যোগ দেয়। মেয়ে পুতুলের মতো এই টুসুর মূর্তি। মাথায় রাংতার মুকুট, পরনে লাল, নীল কাগজের শাড়ি থাকে। হাতে, গলায় সোনালি রাংতার গয়না। টুসু শস্য দেবী হিসেবে পৌষমাসব্যাপী বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পূজিতা হন।

আবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাঙবুরুকে স্মরণ করে তির বেঁধানোর প্রতিযোগিতা হয়। এই লোকউৎসবের পরিচয় রয়েছে 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষের' মতো গল্পে। স্বজন ও বাস্তুহারা রূপাই বাবুর ধান বিক্রয়ের টাকা ফেরত না দিয়ে দেশে দেশে সে ঘুরে বেড়ায় নিজের ঘর বাঁধার স্বপ্নে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন লোকউৎসবে উপস্থিত হয়েছে রূপাই—

> "এখন এই সময় দূরে দাঁড়িয়ে থাকে যে লক্ষ্যবস্তু যা এই বেলার বিষণ্ণ আলোর আকাশে দেখায় কালো গহীন জলে ভাসা এক রূপোলী মাছ অথবা দেখায় গাছের ডালে বসা কোনো আনমনা পাখি তার দিকে তীর ছুটবে মাছরাঙার মত বা তীর ছুটবে কালো কেউটের মত।" [৪৮]

কোনো কোনো ছড়ায় আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক বাস্তবচিত্র উদ্ঘাটিত হয়। অসংলগ্নতার মাঝেই ঐতিহাসিক সত্যের মতো নির্মম অন্তর্বেদনার পরিচয় জাতির স্মৃতিবাহক। তাই ছড়াগুলি মানবমনে স্বতোৎসারিত। অঞ্চলভেদে ভাবনার বাহ্যিক প্রকাশ ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ধরা থাকে। রাঢ় অঞ্চল নির্ভর মানুষের সুখ-দুঃখের নানান কথা ছড়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন অমর মিত্র তাঁর নানান গল্পের আধারে। 'গাঙ-ধুলোটের চতুর্ভুজ' গল্পে লস্কর ভূমিশূন্য রাজা। কেননা সে পাহারা দেয় আটুকুড়ো পিসির সম্পত্তি— জোড়া দিঘি। এই দিঘিদ্বয়ের নাম হালো আর কালো। গ্রামের মানুষেরা এই দিঘির গর্বে ছড়া বানিয়েছে—

"হালো কালো ডিম সা
মধুমুরলী কন্দ সা
জল খাবি তো হালোয় যা।" [৪৯]

—হালোর জল মিষ্টি, আর কালো দিঘি তো বুড়ো মাছের গায়ের রঙে কালো।

'সোনামুখী মধুপুরী' নামক গল্পের মধ্যে ছড়ার পরিচয় দিয়েছেন অমর মিত্র—

"বড় দুঃখের রেল।
নাহি হেল দেল" [৫০]

আবার এই গল্পেই হামীরহাটি ইস্টিশন প্রসঙ্গে লেখা বর্ণনা হল— "ইস্টিশন আছে, দেয়াল ধসা ভাঙাচোরা, শ্রীহীন, যেন লণ্ডভণ্ড হয়েছে বড় লাঠালাঠি আর কাটাকাটিতে।" ছড়ার মধ্যে এই প্রলয়ঙ্কর রূপ ধরা রয়েছে—

"লাঠালাঠি কাটাকাটি
এই নিয়ে হামীরহাটি।" (সোনামুখী মধুপুরী)

সোনামুখীর মেয়ে চম্পাবতীকে নীলাম্বরীর নীল রঙে বেশ মানায়। এটা সোনামুখীর গর্বের বিষয়। স্বামী বনবিহারীর সাথে ট্রেনযাত্রার পর গোধূলি বেলায় সোনামুখীর মেয়ে চম্পাবতীকে সোনামুখী গ্রামে উজ্জ্বল আভায় ছড়ায় বেঁধে রেখেছেন লেখক অমর মিত্র। তার রূপ ও বাপের বাড়ি-শ্বশুরবাড়ির প্রসঙ্গ ধরা রয়েছে ছড়ায়—

"সোনামুখী মধুপুরী
গায়ে তোর নীলাম্বরী
দেখিলে চোখ সরাতে নারি।" (সোনামুখী মধুপুরী)

'ঘর দালানে মোরগফুল' গল্পে রমারাণীর ননদিনী বাসন্তী মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে পারে। সে ভাদু ও টুসুর কবি। তার প্রতিভা ছড়ায় ধরা পড়ে—

"আমড়া গাছে আম ফলে
তেঁতুল গাছে নিম রে

মা সন্তোষীর পত্তরে ভয়ে হিমশিম রে
তুই পত্তর পাবি না, টক ছাড়া তোর দিন চলে না, তা আমি জানি রে।" [৫১]

বাসন্তী আর একটি ছড়ায় রমারাণীর বাপের বাড়ি যাওয়ার প্রসঙ্গে বলেছে—

"বাড়ির নাময় কুয়া কুঁড়লাম, ঘটি ডুবায়ে জল খাব
এমনি কুয়া নিঠুর হ'লো, শালুক ফুল ফুটে গেল।" (ঘর দালানে মোরগফুল)

রমারাণীর বাপের বাড়ি যাবার প্রসঙ্গে এবং স্বামীর ঘর না করে উড়ুউড়ু মনের কথায় দাম্পত্য প্রেমানুভবের পরিচয় ধরা রয়েছে। আর একটি ছড়ায় বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা হল—

"একদিনকার হলুদ বাটা, তিন দিনকার বাসি লো।
মা-বাপকে বঁইলে দিবি, বড় সুখে আছি লো...।" (ঐ)

গল্পে স্বামী-শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদের সাথে রমারাণীর দাম্পত্য জীবনের পরিচয় নানান ছড়ায় উঠে এসেছে। কেবল বাসন্তী নয় তার ভাই নিত্যগোপালের মুখে রমারাণীর প্রসঙ্গে ছড়া উচ্চারিত হয়েছে—

১. "বড় ঘরের দুয়ারে জোড়া, জোড়া ময়ূর ঘুরে লো।
কাল দিখেছি বেল ফুলটি, আজকে মনে পড়ে লো।" [৫২]

২. "বাপ হয়েছে ঘর জামাই, মেয়ের লাজ নাই হে
ঘর দালানে ধান পেকেছে, কোথায় মোরগ ফুল হে।" [৫৩]

নিত্যগোপালের ঘরে শান্তি নেই, নেই প্রেম তাই বাপের বাড়িতেই থাকতে চায় রমারাণী। সেখানে শুক্রবারে টক খাওয়া বারণ, তেঁতুল গাছে নিম ফলে, এমনকি কাঠবিড়ালিও নেই। তাই তার মন ভালো নেই। এই অভিমান ও অনুরাগকে সম্বল করেই নিত্যগোপাল বলেছে— "তুমি (রমারাণী) চলো, কাঠবিড়ালিও সঙ্গে যাবেক, তেঁতুলগাছে টক হবেক।" অনেক অনুনয় বিনয়ের পর রমারাণীর মন টলাতে পেরেছে নিত্যগোপাল। এই ছড়ার মধ্যে সেই ভালোবাসার পরশ পাওয়া যায়—

"কাল দিখেছি খোপার ফুল, মুখটি মনে পড়ে হে।
আজ দিখেছি মোরগফুল, মুখটি হাঁরাই যায় হে।" [৫৪]

অমর মিত্রের গল্পে সমাজ জীবনের নানান ছবি ধরা রয়েছে। অসামাজিক প্রেম, বিবাহ, কলহ, অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে জীবন সংকটও নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে গল্পের চরিত্রগুলি। 'শাপভ্রষ্টা' গল্পে অদ্রীশের বিবাহপূর্ব প্রেম ছিল কাবেরীর সঙ্গে। দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে কাবেরী মারা গেছে। কাবেরীর মৃত্যুর পর তাই জীবনবিমার টাকা পেয়েছে অদ্রীশ। সহকর্মীদের ঠাট্টায় উঠে এসেছে প্রবাদ—

"ভাগ্যবানের বউ মরে।" [৫৫]

'সোনামুখী মধুপুরী' গল্পে রেল ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ার সাথে হেঁপো মানুষের তুলনায় এবং চম্পাবতীর নীলাম্বরী শাড়ির মানানসই সৌন্দর্যে গল্পকার রাধার প্রসঙ্গ এনেছেন—

"রঙটি যদিও বেজায় কালো
নড়লে চড়লে দেখায় ভালো।" [৫৬]

বঙ্গ প্রকৃতির আবহ লোকসঙ্গীতের মধ্যে ধরা রয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে লোকসঙ্গীতের বিবর্তন ঘটে থাকে। অমর মিত্রের 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ' নামক ছোটগল্পের রূপাই-এর মনে ফাল্গুনের মিলন মধুর মুহূর্ত উঁকি দিয়েছে—

"হেই কাঁসাই নদীর উপারে
কামের খোঁজে যাইবনি
ই দিশেতে ঘর বান্ধবো
সঙ্গে লিয়া রমণী।" [৫৭]

'ঘরদালানে মোরগ ফুল' গল্পে বগলাচরণ গুনগুন করে গেয়ে উঠেছে আবেগমথিত গান—

"তুমি তরু আমি লতা, বেড়িয়ে রাখিব হে।
যাও দেখি কোথা যাবে, আমারে ছাড়িয়ে হে।" [৫৮]

আবার 'পথ হেলে দুলে যায়' গল্পে রয়েছে একাধিক ছড়ার মধ্যে মেঠো সুরের পরিচয়—

১. "পথ হেলেদুলে যায়
পথ শউরঘরে ধায়" [৫৯] (শউরঘর-শ্বশুর ঘর)

২. "গাঁয়ের প'ধান দেশের নেতা
তারে কও মনের কথা।" [৬০]

৩. "মেয়ে আছে তাই জামাই আদর,
নইলে জামাই গাছের বাঁদর।" [৬১]

'ধুলোরং' গল্পে বৃন্দাবন ও ললিত মাহাতোর কণ্ঠে আবেগমথিত প্রেমের গানে ব্যক্তিনির্ভর প্রেমচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃন্দাবন গেয়েছে—

১. "আহা নীল শাড়ি ও ধনি, তোর সোনার অঙ্গ গোরা।
কপালে সিদুঁর ফোঁটা নয়নে কাজলা,
বেণীটি গাঁথলে ধনি অতি মনোহরা।" [৬২]

২. "ও কালা ও তোরে বলি, কালা তোর কালিয়া বরণ;
মোহন মুরলী স্বরে ও তুই ফিরাস যে গোধন।" [৬৩]

৩. "আহা লাল ডুরে, ও ধনি, মন অতি মনোহরা
তিয়াসে বুক ফাটে ধনি, জল দিব আঁজলা আঁজলা

কপালে সিঁদুর ফোটা নয়নে কাজলা,
খোপাটি ভাঙলে ধনি অতি মনোহরা . . . ।” [৬৪]

সরকারী আমিন বৃন্দাবন সামান্য পয়সা রোজগার করেই সংসার চালিয়েছে। সে ঘুষ নেয় না। বউ অতসীর কথায় সে কর্ণপাত করেনি। বৃন্দাবনের কোমল মনটি সর্বদা গুনগুন করে রসের সাগরে ডুবে থাকে। অভাবী সংসারে সত্যিই সে ভালো মানুষ।

মানব চক্রবর্তী

মানব চক্রবর্তীর গল্পে অকৃত্রিম জীবনবোধ ও নিষ্ঠুর বাস্তবতা ধরা রয়েছে। মানুষের লোভ, শঠতা, বঞ্চনা, প্রতিহিংসার ছবি জীবন্ত বলে মানুষের সুখের সময়, আনন্দের ফুরসত বেশি নেই। অতিসাধারণ জীবনে অভ্যস্থ মানুষগুলির চাওয়া পাওয়া তাই অতি সামান্যই। 'পিত্তি' গল্পের ওয়াটার-ওয়ার্কসের ভালভ-ম্যাল যুগলকিশোর বদরাগি সত্ত্বেও প্রবাহিত জল দেখে তৃপ্তিবোধে আচ্ছন্ন হয়। কর্মময় জীবনের ফাঁকেই হঠাৎ গানের সুরে তার মন দোলায়িত হয়। বহুদিন আগে কেঁদুলির মেলায় শোনা পছন্দের গান সে মনে মনে আওড়ায়—

'জল বিনা জীবন মিছা,
জলের তরে মরা-বাঁচা,
জন্মের আগে জল
মরণের পরে জল,
মধ্যে আমি জউল্যা-যুগল,
জীবন গাড়ির কলকব্জা।' [৬৫]

এই বদরাগি যুগলকিশোর একদিন স্ত্রী বিলাসকে দু কেজি ওজনের মাছ কাটতে দেয়। বটিটার হাল দেখে বিলাস ভয় পায়। সে বলে— 'এই বটিতে অতবড় মাছ কাটা যায় ?' তখন বদরাগি স্বামীর কাছে বিলাস প্রবাদ শোনে—

'নাচতে না জানলে উঠানের দোষ।' [৬৬]

অর্থাৎ যুগলকিশোরের কাছে অসাধ্য বলে কিছু নেই— 'মাছ ক্যান, মানুষ কাটা যায়!'

নলিনী বেরা

সাহিত্য সাধক মাত্রই বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সাহিত্য স্রষ্টার ব্যক্তিমানস ও পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে বাণীরূপ লাভ করে। আসলে সাহিত্যিকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রতিফলন উচ্চতর সাহিত্য সৃজনের সহায়ক। এবং সেই সাহিত্যই শাশ্বত হয়ে স্রষ্টাকে স্মরণীয় করে রাখে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গণতান্ত্রিক দেশে সাংবিধানিক পরিমণ্ডলে মানুষের অভাব ও দারিদ্র্যের দিনযাপনের কাহিনিকার হিসেবে নলিনী বেরা ছোটগল্পের পাতায় সাহিত্য সৃজন করেছেন। তাঁর গল্পে লৌকিক উপাদানগুলি কীভাবে ছড়িয়ে রয়েছে উদাহরণের উল্লেখে তা স্পষ্ট হবে।

নলিনী বেরা গ্রাম্যজীবন কেন্দ্রিক কিছুটা সময় অতিবাহিত করেছেন বলেই হয়ত গ্রাম্য সমাজের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। 'হোমগার্ডের জামা' গল্পের কথক অজান্তেই পাঠকের ভূমিকা নেয়। মেজকাকার প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে প্রবাদ— 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁর বুনে, কী হল তাঁতির হেলে বলদ কিনে ?'—এটি আসলে চাষ-আবাদ বিষয়ক প্রবাদ। আরেকটি প্রবাদ হল— 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় ?'—পারিবারিক সম্পর্ক নির্ভর প্রবাদটি গল্পে যথেষ্ট মানানসই হিসেবে গল্পকার ব্যবহার করেছেন। আবার লৌকিক দর্শনমূলক প্রবাদের পরিচয় রয়েছে 'চোরের সাতদিন, গৃহস্থের এক দিন।'

নলিনী বেরা-র ছোটগল্পে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামীণ জীবনে সাপের উপদ্রবের জন্য মনসাদেবীর প্রতি মানুষের ভয় ও বিশ্বাসের সাথে প্রাণ বাঁচানোর জন্য পূজার্চনার প্রচলন রয়েছে রাঢ়বঙ্গে। এমনকি তুকতাক, ঝাড়ফুক, মন্ত্রতন্ত্র ও ভুজুংভাজাং-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে কুসংস্কারকে বদ্ধমূলভাবে বিশ্বাসে পরিণত করা হয়। আর মানুষ অতি স্বাভাবিক ভাবেই এইসব অপবিজ্ঞানকে অবলীলায় মেনে চলে। যেমন— 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা' গল্পে উমাকান্তের রচিত শীতলামঙ্গল কাব্যের শতাব্দী প্রতিভূ চরিত্র দিবাকর সিং। সে জাতিতে ভূমিজ, মানুষকে ভুজুং-ভাজাং দেয়। মন্ত্র বলে সে শূন্য থেকে সাপ নামায়। এমনকি ঝাঁপানের 'বারি' তুলতে গিয়ে জল থেকে সাপ তোলে। যা তার কাছে মন্ত্রশক্তিস্বরূপ। ঝাঁপান উৎসবে সে একটি সাপকে হাতের মধ্যে রেখে ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলে—

> "শুনো শুনো গুণীভাই করি নিবেদন।
> গণেশের গজমুন্ড কিসের কারণ।।
> মনসার পদে মোর অসংখ্য প্রণাম।
> সাখীর জবাব দিয়ে চালাও ঝাঁপান।।" [৬৭]

শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিনে সন্ধ্যেবেলা ঝাঁপানের 'বারি' (জল) তোলার সময় ভক্তকুল এরূপ

প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। 'জয় মা বিষহরির আজ্ঞায়' 'বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাঁপান'। বলতে বলতেই দিবাকর সাপ বের করে দেয়। এভাবেই লোকসমাজে সে জনপ্রিয় ব্যক্তি।

আধিভৌতিক প্রসঙ্গে লোকায়ত বিশ্বাস ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে বেশ কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। ভূত-প্রেত এর প্রতি সমাজ জীবনে দীর্ঘ দিনের একটি বিশ্বাস জন্মেছে বলে মানুষের প্রতি মানুষের সন্দেহ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ভয় ভীতি থেকে কুসংস্কার কীভাবে জন্ম নিয়েছে তার প্রমাণ রয়েছে 'ভূতজ্যোৎস্না'য়—

> "এই রে! ভর সাঁঝবেলা খালমুহে, শ্মশানে দাঁড়িয়ে মাছ ধরার কথা বলায় এ কে মোকে ঘর থে ডাকি আনলা ? মনে মনে বলে, সন্দেহ করে, নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে সরিন্দর জাল গুটিয়ে ধর্মের পথে হাঁটা দিল। হাড়-জিরজিরে লোকটাও নাকি ও মিনমিন স্বরে কি সব বলে পিছু পিছু হাঁটতে লাগল।" [৬৮]

আবার প্রবল বৃষ্টির হাত থেকে পরিবারকে বাঁচানোর জন্য লোকবিশ্বাস রয়েছে—

> "তুই সবার ছোট, এখনো দাগ পড়েনি, শুদ্ধ আছিস। গামছা পরে লাঙলটা গোবরগাদায় একবারটি পুঁতে দিয়ে আয় ধন। না হলে এই বর্ষায় ঘরদোর সব ভেসে যাবে বাপ আমার।" (বর্ষামঙ্গল)

আকাশ বা মেঘ থেকে হলহলিয়া সাপ পড়ার প্রসঙ্গের পরিচয় রয়েছে নলিনী বেরার ছোটগল্পে, যা দীর্ঘদিনের লোকবিশ্বাস বলে পরিচিত। আর এ কুসংস্কার নিয়েই গ্রামীণ চরিত্রগুলি দিনগুজরান করে। যেমন—

> "পরমেশের সেজ কাকিমা হাঁপাতে হাঁপাতে দু'হাতের আঙুল মেলে ধরে দেখায় তার শাশুড়িকে— গুড়পুটলু করে 'মেঘপাতাল' থেকে হলহলিয়া সাপ পড়ল গো— অ্যাই এত্ত মা!" (বর্ষামঙ্গল)

এর উত্তরে মা যা বলেছে তাও কুসংস্কার এবং লোকবিশ্বাসের পরিচয়বাহী—

> "—মাথায় পড়েনি তো বাছা ? আজ কী বার— মঙ্গল আর শনি— এই দু'দিন যদি পায়ে পাক দিয়ে জড়ায় হলহলিয়া, তবে কার সাধ্য মেঘ ডাকা না পর্যন্ত তাকে পা থেকে ছাড়ায়!" (বর্ষামঙ্গল)

'হাঁসচরা' গল্পের নায়ক তথা কথক হাঁসচরা গ্রামে যাবার পথে নদী পার হবার সময় ভূতের চক্রে পড়ে নদীর মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। ভূতের পাল্লায় পড়ে নদী পার হতে পারেনি। গ্রামের লোকের কাছে এ বিশ্বাস দীর্ঘদিনের—

> "গ্রামের লোকে তো বলে, বাউটিয়া ভূত। রাত বিরেতে তার হাবড়ে পেলে রাতভর তোমাকে ঘোরাবে। যতক্ষণ ভোর না হচ্ছে, ততক্ষণ পথের দিশা তুমি পাচ্ছ না। এ কি তবে সেই ?" (হাঁসচরা)

অলৌকিকতার প্রতি মানুষের বিশ্বাস দীর্ঘকালের। প্রাকৃতিক নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষের জীবনযাপনে কুসংস্কারগুলি বদ্ধমূল ধারণার মতো দীর্ঘস্থায়ী হয়ে রয়েছে। 'ভূত ভূত' গল্পে রয়েছে ভূত পোষার প্রসঙ্গ। জেনাবুড়োর ভূত রয়েছে জেনে রতিকান্ত কৌতূহলী ও ভীত ছিল। সে মনে মনে ভূতের সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভেবেছিল— আশা ও হতাশার কথা, সংশয়ের কথা। একদিন—

"বসে থাকে চুপে চোখ মুদে রতিকান্ত। যেন চোখ খুলে দেখল— দাঁড়িয়ে কেউ একজন
আনকা লোক। 'কে তুই ?' নড়ল চড়ল সে। পাখির ডানার ঝটাপট নামা-ওঠা যেমন,
তেমন দু'হাতে নিচ ওপর হাওয়া কেটে বলল, 'আমি ভূত'।" (ভূত ভূত)

আবার দেখি গল্পের শেষে রতিকান্তকে ভূত তোষামোদ করছে। সে রতিকান্তের কাছে থাকতে চায়। তাকে মহাজন বানাতে চায় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ও ধন দৌলত দিয়ে—

"অশরীরীও দৌড়ুচ্ছে 'রাখো, রাখো রাখো আমাকে। লাভ বই তুমার ক্ষতি কিছু না।
রাখো তো রাখো।' সবেগে দৌড়ুচ্ছে রতিকান্ত। হাহা হিহি হাহা হিহি—" (ভূতভূত)

নলিনী বেরার গল্পে লৌকিক উপাদান হিসেবে লোকসঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায়। 'শীতলামঙ্গল' গল্পে যাত্রাপালায় নবীন নেচে নেচে গেয়েছে—

"ওগো ফুটেছে এত ফুল ফুলমালী কই।
গাঁথিবে মালা কবে সেই আশে রই।।" (শীতলামঙ্গল)

যাত্রাপালার ম্যানেজার ভবা দাশ লোকবাদ্য ঢোলক বাজিয়ে বোল তুলে—

"যুগী ধড়ফড় কাঁথ ভাঙি পড়।
যুগী ধড়ফড় কাঁথ ভাঙি পড়।।" (শীতলামঙ্গল)

এই গল্পে সনকা নামক চরিত্র কাঁদতে কাঁদতে গেয়ে ওঠে বিষাদের গান—

"উঠিলা সোয়ারী বসিলা নাহি, মাগো।
ফিরি চাঁহিবাকু দিশিলা নাহি, মাগো।।" (শীতলামঙ্গল)

অর্থাৎ কিনা বরের পাল্কী (সোয়ারী) আমাকে নিয়ে সেই যে উঠল আর তো বসল না। পাল্কীতে বসে পিছন ঘুরে তোমাকে দেখার কত চেষ্টা করলাম, মাগো, তোমাকে দেখা গেল না! —কি বুক ফাটা গানের কথাকলি! ঠিক একই কলির পরিচয় রয়েছে 'ভূতভূত' গল্পের মধ্যে।

রাঢ় বঙ্গের মানুষেরা হরিমন্দিরে কীর্তন গানের আসর জমাতে ভালোবাসে। খোল-করতাল, ডিগি-তবলা, হারমোনিয়াম— ইত্যাদি লোকবাদ্যের সমাগমে তারা হরিবাসর জমিয়ে দেয়—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" (বর্ষামঙ্গল)

লোকখাদ্য তাঁর গল্পের লৌকিক উপাদানের জায়গা করে নিয়েছে। 'গ্রামের চিঠি' গল্পে 'লব্ধা' অর্থাৎ লোধা সম্প্রদায়ের মানুষেরা অভাবের তাড়নায় পিঁপড়ের ডিম (কুরকুট) খায়। ভর নামক একটি

অলৌকিক বিষয় গ্রামীণ সমাজ জীবনে দীর্ঘ দিন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। দেবতার অনুগ্রহ বা কৃপা কিছুটা সময় কারো ওপর বর্তায়। সে আর প্রকৃত মানুষ থাকে না লৌকিক মানুষ অলৌকিকতায় শক্তিশালী ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বা স্রষ্টা হয়ে যায়। মানুষ দেবানুগ্রহের ভরসায় বিশ্বাস করে। 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা' গল্পে দিবাকর সিং মনসাতলায় কাঁসির শব্দে ধুনোর গন্ধে একটি ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি করে দেবতার উদ্দেশ্যে বলে— "কাঁসা— পিট্ পিট্ কাঁসিন বাজে আও রে! কোন্ কোন্ দ্যাব্তা আও রে! পবন দ্যাব্তায় ভর করল দিবাকরের ওপর। শূন্যে লাফ দিয়ে উঠল সে।"

লৌকিক উপাদান হিসেবে ছড়ার জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। বাক্কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির এই ধারাটি লোকসমাজে সাধারণত শিশু ও নারীদের মধ্যেই বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে প্রসঙ্গের বৈপরীত্যে ছড়া ব্যবহারও যথেষ্ট মানানসই বলে মনে হয়। যেমন—

'খরা দিচ্ছে মেঘ দিচ্ছে খেঁকশিয়ালের বেহা হচ্ছে—' (বর্ষামঙ্গল)

কিংবা 'মাছ কাটলাম চেকা চেকা, ও লো জামির কাটলম দু-চেকা।' (বর্ষামঙ্গল)

আবার বাল্য বিধবা প্রভা বিশুইকে উদ্দেশ্য করে তৈরি হয়েছে ছড়া—

'পরভা রে পরভা
কি তরকারি রাঁধবা ?
যৌ ফলটার ডাঁটি নেই
সৌ ফলটা রাঁধবা।' (বড়া ভাজা, কটা চোখ ও বঙ্গিম বধুকের গল্প)

ডাইনি বা ডাকিনী বিদ্যার প্রসঙ্গ নলিনী বেরার গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলের মানুষের কাছে এই কুসংস্কার প্রাণসংহারক। মানুষের প্রতি মানষের চরম আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস, স্বজন হারানো বা জটিল রোগাক্রান্তের ফলে মানসিক স্থিরতা তলানিতে পৌঁছায়। মানুষের ভয়ংকর রূপ কুসংস্কারের মাত্রাকে তীব্রতর করে তোলে সমবেত জনতার প্রকোপে। 'বড়াভাজা কটা-চোখ ও বঙ্গিম বধুকের গল্প' নামক গল্পের কথক তথা লেখক বলেছেন— 'ডান-ডাইনি ? স্রেফ কুসংস্কার! বুজরুকি!'

আবার ডাইনি বিদ্যার কথা বলতে গিয়ে ডাইনিদের স্বভাব কর্মের প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলেন—

> "আমরা যখন ছোট, খুব ছোট, বড়দের মুখে প্রায়ই শুনতাম— ডাইনিরা রাতের বেলা ঘর ছেড়ে গরু-ছাগলের মতো মাঠঘাটে চরতে বেরোয়। তারা নাকি অর্ধচন্দ্রাসনের মতো হাত দুটো উল্টে মাটিতে, বুক উদর-মুখ নীলিম আকাশের দিকে আর কপাল কী জিভে জ্বলন্ত প্রদীপ রেখে হেঁটে হেঁটে চরে বেড়ায়।" [৬৯]

গ্রামের মধ্যে কে বা কারা ডাইনি তাও দ্বিধাহীন ভাবে উল্লেখ করেছেন গল্পকার— কামারবুড়ি, লইতনের মা, মলিবুড়ি, বকড়িরা। কামারবুড়ির চোখ কটা, বিড়ালের চোখের ন্যায়, বয়স আশির ওপর। আবার অনন্তর বোন বকড়ির চোখ মুখ কাটাকাটা প্রতিমার মতো, ফর্সা গায়ের রং, পিঙ্গল চুল, নিষ্প্রভ চোখের দৃষ্টি, যেন ঢুলুঢুলু। তার খরাল চাহনিতে যেকোন লোকের বুক জ্বলে যেতে পারে। এইসব চরিত্র, স্বভাব

ও বয়সের মেয়ে মানুষের যেন মরণ নেই। অথচ অন্য মানুষের মৃত্যু হলে এদের নামে অপবাদ চাপায়। ডাইনি বলে পিটিয়ে মারে। আজও এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেনি এ বঙ্গের মানুষজন।

লোকসমাজে নানান লোককথা ছড়িয়ে রয়েছে। নলিনী বেরার গল্পে লোককথা রূপকথার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে 'বর্ষামঙ্গল' গল্পে। বেগুনবতী রাজকন্যার—

> "কুঁচবরণ দেহ মেঘবরণ চুল! আর চুলের দৈর্ঘ্য সাড়ে বারো হাত। চুল খুলে সিনান করতে করতে কী করে যে ছিঁড়ে পড়ল একটা চুল! সে চুল ভেসে যায় নদীর জলে— যায় তো যায়। নদী কী আর, সপ্তসিন্ধু। এ কূল ও কূল! ক্রমে ক্রমে একটা ঘাট পড়ল। সে ঘাটে সিনান করে বরুণ কুমার। মস্ত রাজার বেটা রাজকুমার। সে অপরূপ দেখতে। হুঁ, তারপর ? তারপর আর কী! সেই চুল ভাসতে ভাসতে এসে পড়ল বরুণকুমারের হাতে। আঙুলে জড়াচ্ছে তো জড়াখে রাজার বেটা যুবরাজ। চুলের একমুড়ো পাওয়া যায় তো আরেক মুড়ো পাওয়া ভার! লম্বায় সাড়ে বারো হাত। এতো বড় চুল যে কইন্যার, না জানি সে কত সুন্দর! বলেই রাজার বেটা রাজকুমার রোদন করল।" [৭০]

নলিনী বেরার ছোটগল্প লোককথার উপস্থাপন কৌশলে পাঠককে যেমন মুগ্ধ করায় তেমনি বাস্তবতার আলোকে বিষয়গত প্রসঙ্গটি যেন জীবন্ত হয়ে যায়। 'পুষ্করা' গল্পে মেজকাকা কালপেঁচা দেখে ঢিল ছুঁড়ে মারার ফলে গল্পের কাহিনি উর্দ্ধগতি পেয়েছে। ভাস (লোকবিশ্বাস কেন্দ্রিক প্রথা) জেনে আঁৎকে উঠেছে পরিবারটি— পুষ্করা দোষ লেগেছে। যাগযজ্ঞ, স্বস্ত্যয়ন করার জন্য একশো আটটা পদ্ম আর সাড়ে ন'সের ঘৃতাহুতি-র ফর্দ তৈরি হয়েছে। আর এই বিপুল খরচের টাকা জোগাড় করে। এভাবে গৃহস্বামীর বা গৃহস্থের দোষ কাটানোর উপায় রয়েছে সমাজ জীবনে। পুষ্করা আসলে একটা বিশেষ পদ্ধতি বা লোক বিশ্বাসমূলক লোক কথা— বাস্তুদোষও বলা যায়। আর এর হাত থেকে রেহাই পেতে উপায় হল—

> "ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সিদ্ধান্ত হল এই— রাতটুকু সে থাকবে ঘরের ভিতর, রাত পোহালে ভোর না হতেই সে হয়ে যাবে পগারপার, ত্রিসীমায় আর তার টিকিটিরও দেখা মিলবে না।" [৭১]

অর্থাৎ যজ্ঞের দিন এমন জটিল নিয়মের পর অলৌকিক দুষ্ট শক্তিটি ঘরের বাইরে চলে যাবে। এমন কি পায়ের ছাপ দেখা যাবে বলে প্রত্যেক ঘরের দরজার সামনে বালির আস্তরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে পুরোহিত। ঐ দিন সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে বাড়িশুদ্ধ সবাই শুয়ে পড়ে। সংশয় হয় যদি ঘর থেকে না বের হয় পুষ্করা ইত্যাদি। কিন্তু গল্পের শেষে গল্পকার সমস্ত দুঃশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়েছেন, পুষ্করার মতো লোককথাকে জীবন্ত রেখেই। যজ্ঞের পরদিন সকালে বালির আস্তরণে ঝুঁকে পড়ে সেজকাকা যা দেখেছে তাতে গভীর তাৎপর্যের আস্তরণে ঢাকা রয়েছে অলৌকিক শক্তির ছাপ—

> "তিন তিনটে পায়ের ছাপ। চিহ্নিত, মুদ্রিত, ভয়খচিত ত্রিপাদ! ভরসা যা এই— তিনটে পা-ই বহির্মুখী, স্পষ্টচিহ্নিত বর্হিগমন।" (পুষ্করা)

সৈকত রক্ষিত

রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীণ জীবনের সাথে সৈকত রক্ষিতের নিবিড় সম্পর্ক ছিল বলেই তাঁর গল্পে গ্রামীণ সমাজে বসবাসকারী মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সমাজ, পূজা, পার্বণ, ধর্মীয় আচার-আচরণ, জীবনধারণের মান, ছড়া, প্রবাদ, লোকনৃত্য, লোক উৎসব, লোকগীতি, তন্ত্রমন্ত্র, লোকশিল্প, লোকচিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়গুলি লোকসংস্কৃতির অঙ্গ বা উপাদান হিসেবে রাঢ় অঞ্চলের ঐতিহ্য পরিবেশিত হয়েছে।

গ্রামীণ মানুষের মনভোলানো প্রাণকাড়া মেঠো সুর প্রাণের আবেগ নিয়ে ঘটনার ঘনঘটায় চরিত্রের মুখে উপস্থাপিত হয়েছে। সৈকত রক্ষিতের বেশিরভাগ গল্পে লোকসংগীতের ব্যবহার দেখা যায়। 'আঁকশি' গল্পে শিমূল গাছ থেকে আঁকশি দিয়ে শিমূল ফল পাড়ার ওস্তাদ মাগারাম। বৈষ্ণবপুর, তলাড়ি, মালাড গ্রাম ঘুরে বেড়ায় সে। সঙ্গে বউ বেদনি ও ছেলে নীলকমল। এরা সাঁওতালদের বস্তিতে ভালুকের নাচ দেখে খুশি হয়। ছোট্ট নীলকমল ভালুকের নাচের মতো নেচে নেচে এগিয়ে যায়। বিস্ময় ও খুশিতে মন ভরে যায় পিতা মাগারামের। সে নীলকমলের দৃশ্য দেখে ভাবে— যেন সে তার সন্তান নয়— জঙ্গলেরই জীব। আর সে নিজে রাঢ়ের বাজিকর। হাতে অদৃশ্য ডুগডুগি নিয়ে সেই ভালুকয়ালার মতো, নাচের তালে তালে গান ধরে—

''গ্যান ঘ্যাটা গ্যান...
গ্যান ঘ্যাটা গ্যান...
জঙ্গলকে ভালু— জঙ্গলকে এ এ এ...
জঙ্গলকে ভালু... জঙ্গলকে'' [৭২]

গান গাইতে গাইতে মাগারাম মুচি দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে রুজি রোজগারের সন্ধানে।

'মাড়াই কল' গল্পে বোকা হাঁদা চেপুলাল বেশরা নিজের জীবন ও পরিবারের কথা ভাবে না। সে কুঞ্জ মোদকের আখের খেত দেখাশোনা করে। আখ থকে গুড় তৈরি করে বিক্রি পর্যন্ত সমস্ত কাজ করে দেয় কুঞ্জ খুড়ার। শীতের সময় শালঘরের চাল ছাওয়ার কাজ শেষ করে ঝাঁটি কেনার জন্য পাহাড় থেকে আসা সাঁওতাল মেয়েদের কাছ যায়—

গাড়িতে উঠে চেপুলাল, নিজের পিঠে চাবুক মেরে গাড়ি ছেড়ে দেয়। তারপর সে গান ধরে। এপাশ-ওপাশ ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলে—

''বাঁশপাতাটি সরু সরু
বেলপাতাটি কল্পতরু

শাগের পাতা কলমিলতা
অগাধ জলেও ডুবল না
দিলদরিয়ার মাঝে
ডুবে দেখরে অজব্ কারখানা . . .” (মাড়াইকল)

‘দাহভূমি’ গল্পের চৈতন রাজোয়ার বিচিত্র বৈশিষ্ট্যময় মানুষ। কিন্তু সে জানে না নদী রোজই কোথায় বয়ে যায়। চৈতনের এই অজ্ঞানতা তাৎক্ষণিক বেঁধে দেওয়া গানে প্রকাশ পায়। আবেগ সর্বস্বতায় ক্লান্তি অবসাদ ও অনাহার ভুলে দুহাত মেলে গেয়ে ওঠে—

“কন্ধারের লদী রে বঁধু, কন্ধারকে গেলি
সাঁঝে ফুটল ঝিঙাফুল বিহানে হারালি
বঁধু তুঁই কন্ধারকে গেলি . . .” (দাহভূমি)

‘পট’ গল্পে ‘ছো-নাচের’ মহড়ায় গণেশ বন্দনার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকনৃত্যের তালে পাইট্কার শিশুরা মেতে থাকে—

“গণেশ নাচে থাপাক থুপুক
কাৎতিক যায় উড়ে
পর্শুরামের বুচা টাঙি
দাদা, কার ঘাড়ে পড়ে . . .” (পট)

পাইট্কার গুহিরাম, মৃত হড়বড় মুদির সন্ধানে কুল্হিতে উপস্থিত হয়। সে যে প্রকৃত পাইট্কার তার প্রমাণ স্বরূপ কর্মফলের পট মৃত ব্যক্তির বাড়ির লোকজনকে দেখায়। একটু একটু করে পটটিকে সে মেলে ধরে আর তাতে আঁকা দেব-দেবীর ছবি ব্যাখ্যা করে সুরের প্রকাশে—

“মর্তে সুভদ্রা আছে
বম্ভা বিষ্ণু আছে পিথিবি ধারণ কৈরেছে
ইন্দ্রের দেখ রাজা আছে তুলসাথানে জল দিছে
হাঁড়ির ঝাঁটা বাড়ি মারছে
আঠার পালায় আঠার বংশ জন্ম দিয়েছে।” (পট)

‘ধমন’ গল্পে ভ্রাম্যমান স্বর্ণকারের পেশায় অভ্যস্ত দশ-দশটা পরিবার। তাদের সোনার কারবার না থাকলেও বর্তমানে রূপো, তামা, পিতলের কাজ করে চলমান জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। তারা একস্থান থেকে স্বপরিবারে উঠে গিয়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করে নতুন ভাবে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়। পথ চলতে চলতে লাঠিতে ফাঁসানো বোঝাটা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যায় বাইঙ্গা। আর কাঁধের লাঠিতে দুলুনি দিয়ে গায়—

“না জানি কী ছিল হামার কপালে
হাজার টাকার বাগান খাইল দু-পত্তসার ছাগলে

বঁধু হে, এখন কী করি উপায়—
ভাবের তরি ডুবল হামার একঘটি জলে . . . ” (ধমন)

‘হাম্বা’ গল্পে গোবিন্দ মুচি অভাবের তাড়নায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিং সংগ্রহ করে আড়তদার বা মহাজনের কাছে বেচে দেয়। মুচির ছেলে হলেও হারাধন বাবার স্নেহ পায় সঙ্গে যায়। দড়ির খাট বোনায় সাহায্য করে বাবা গোবিন্দকে। দুটো পয়সা পায় গোবিন্দ। খাট বোনা শেষ হলে প্রকৃতির উদারতায় শিল্প নির্মাণের আনন্দে গুণগুনিয়ে ওঠে গোবিন্দ—

“কিবা দিয়ে যাবি রে মন
কিবা নিয়ে যাবি
পথের সম্বল হরিনাম
কিঞ্চিকও না লিলি
অ-মন
ই-ভবসংসার ছাইড়ে যাবি . . . ” (হাম্বা)

গান শুনে হারাধন দোল খায়, ভুলে থাকে ক্ষুধার কথা। গোবিন্দের শেষ সম্বল গাই বিক্রির পাকা কথা হয় খড়ুর সাথে। গাই পেয়ে খড়ু চলতে চলতে গেয়ে ওঠে—

“এতদিন যে খালিস বাছা
বঝা বঝা খাস রে, বাবু হৈ . . . ” (হাম্বা)

ছোট্ট হারাধনের প্রিয় গাই বিক্রি হয়ে যায় মূলত অভাবের জন্য। একদিকে দারিদ্র্য ও মনের কষ্ট অন্যদিকে নতুন প্রাপ্তির আনন্দে দৃশ্যপট তৈরি করেছেন লেখক।

‘খাদান’ গল্পে ছেলে ভুলানোর জন্য গানের প্রয়োগ দেখা যায়। সরস্বতীর মেয়ে পার্বতী তার বোনকে ভোলানোর জন্য গান ধরে—

“আগড়া ধানের বাগড়া চাল
পাকা বাঁশের টুপা
টুপায় টুপায় ধান পাবি তুঁই
ভাঙিস না লো চুখা . . . ” (খাদান)

সদাহাস্যময় হাবল বৈকালিক চরাচরের মধ্যে পেট ও পাঁজর উন্মোচিত করে খাদানের কাছে পাশে থাকা বউগুলির কথা না ভেবে আদি রসাত্মক কলি আউড়ে দেয়—

“বঁধু, মনে তুমি না করহ কুছু
আমি হৈতে পারি পর, আমি হৈতে পারি পর
আঁধার রাইতে খাদানে আমি ছেঁচেছি পাথর
ছেঁচা পাথর গাদা পাথর—

আমার বুকের পাথর জুড়ায়
বঁধু তুমার ছিঁড়া শাড়ি বাসাতে উড়ায়...” (খাদান)

প্রাণের কথা, ভালোবাসার কথা, প্রকৃতির কথা বলতে চায় হাবল। পাথর খাদানে কর্মরত মানুষগুলির একজন হয়ে নিরন্তন চলমান জীবনের সাক্ষী সে। সড়ক নির্মাণের জন্য পাথর খাদানে গোরুর গাড়ির প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যে হাবলের এই খন্ডদৃশ্য সুন্দর, মুখরিত ও জীবন্ত লাগে। উদাসী মনে চাঁদ তারার মোহময়ী রূপের রহস্যে ডুবে যায়। আর দু'হাত তুলে গেয়ে ওঠে—

“বাবু হৈ, আমার ডেরায় শিয়াল ডাকে তুমার ঘরে কাড়া
তুমার যত খেত-খামার হামি নাংটা নাড়্হা
বল, হামি বাঁচি কী উপায় ?
বাবু হৈ, তুমি হৈলে কাওয়া-বনি হামি ঘুঘু ফাঁদে
তুমার দুয়ারে ভালুক লাচে হামার ব্যাটা কাঁদে
বল, হামি বাঁচি কী উপায় ?...” (খাদান)

‘উঠ রে পুতা জাগো রে পুতা’ গল্পে নেবুলালের কোটরে বসা চোখ, চুপসানো গাল আর বেঢপ চোয়াল সর্বস্ব দাঁত অভুক্ত এক মানুষ যেন দৃশ্যতই উপভোগ্য বৈশিষ্ট্যবাহক। তা সত্ত্বেও স্বভাব বশে দু'হাত দিয়ে লাঠিতে ভর করে থপথপ করে নাচতে নাচতে গায়—

“শাগ্ রাঁধতে বলেছিলি
কচু রাঁইন্ধেছে
সুয়াদে সুয়াদে বাঁদরি
খাঁইয়ে নিয়েছে...” (উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা)

এই নেবুলাল চোখের জল আড়াল করতে হাতের কলকেটা ঊর্ধ্বমুখী ধরে আনমনে, আত্মগোপনে টান মারে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া পরিবেশে নেবুলাল স্বতঃস্ফূর্ত ভাব নিয়ে গেয়ে ওঠে—

“ছল করে গায় গো জলে
শাম ডাঁড়ায়ে কদম তলে
নারী কতই না ছল জানে গো...
হেন রসিক নেবুলালে কয়
মুখের কথা চৈখে হয়
রসিক হয়ে রস বুঝে না
ধিক থাক জীবনে...” (উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা)

নৈশ প্রকৃতিকে সরব রাখার প্রচেষ্টায় গানে গানে ঢোল-ধামসা-মাদলের তালে জাগরণের গান শুরু হয়। আমাবস্যার রাত ও গৃহস্থকে জাগিয়ে রাখতে এবং গো-ধন লাভের আশায় গানের কলি শুরু হয়—

"জাগো মা লক্ষ্মী জাগো মা ভগবতী
জাগে ত অমাবস্যার রাইত রে
জাগাকে পতিফল দেবে মা লছমী
পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই রে..." (উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা)

ঝাঙ্গৈড়াদের আগমনে গৃহকর্তা হারুবাগদি কোমরে লুঙ্গি এঁটে গায়ে কম্বল জড়িয়ে তাদের সামনে দাঁড়ায়। লিডার নেবুলালের দিকে তাকায়। এদিকে নেবুলাল হারুর গোরুগুলিকে জাগায়। হাত বাড়িয়ে দিয়ে গায়—

"অহিরে, হামরা য্যা যাইতে ছিলি
কুল্হির ল্যা কুল্হি রে
তরী দিয়া আ-ন-ল ঘুরায়
বসিয়ে দিল ভাই
অলগ-অলগ মচিলা
খাইতে দিল গুয়াপান..." (উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা)

হারুর পরিবার এই গানের তালে নেচে ওঠে। গরুর প্রতি এই ভালোবাসা গানের বিষয়ভাবনাকে তাৎপর্যে পর্যবসিত করেছে। গানের ডালি নিয়ে লোকজীবনের চর্চার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গল্পের সংলাপ ভিন্নমাত্রায় এগিয়ে গেছে। সৈকত রক্ষিত গল্পের সংলাপে সুকৌশলে গানের সমাবেশ ঘটিয়েছেন এই গল্পে। প্রশ্নোত্তর ধাঁচে গাওয়া মূল গায়েনের সাথে বাকি ঝাঙ্গৈড়ারা গলা মেলায়। সম্পদ সংগ্রহের বিচিত্র কৌশল উল্লেখ করে নেবুলাল গায়—

"আহিরে কেহু ত লেগে ভালা
গুড়খি গুড়খি রে
কেহু ত লেগে উপর ফাঁইন্দ!
আর
কেহু ত লেগে ভালা
বুকে টাড়া দিয়া রে
কেহ ত লেগে রে বুঝাঁয়..." (উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা)

বাদ্য বাজনার সাথে গানের ভেতরের মূল ভাবনার উত্তর দেয় অন্যজনেরা—

"শিয়াল ত লেগে ভাই
গুড়খি গুড়খি রে
চিল্হে ত লেগে উপর ফাঁইন্দ
আর
চোরে য্যা লেগে ভাই বুকে টাড়া দিয়া রে

ঝাঙ্গেড়া ত লেগে রে বুঝাঁয়

অহিরে...”   (উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা)

নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে হারুকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে নেবুলাল। বিনিময়ে মাঙন পেয়ে পুত্রের প্রতি স্নেহশীল পিতার দায়িত্ব পালনের জন্য আনন্দ পায় সে। গৃহকর্তার সন্তানকে নিজের সন্তান মনে করে চোখ কচলে নেবুলাল গেয়ে ওঠে চিরন্তন মানবদরদী গান—

“চন্দ্রমা দপদপ ভুড়কা উঠিল রে
সুরঙ্গী ত ঠুঁকে রে কাঠাড়
উঠো রে পুতা, জাগো রে পুরা
চৈলে যাও ত সুরঙ্গী মইলান।।”   (উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা)

‘খরা’ গল্পে কুয়া খুলা। কুয়া ঝালাই করা, দেয়াল তোলা, চাল ছাওয়া, মাটি কাটা, খাট বুনতে জানা মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবন বড় অভাবের ও করুণ কাহিনিতে ভরা। তাই গাঁয়ে থাকতে মন করে না লখার। সে কালীদাকে কলকাতা যাবার কথা জানায় কাজের সন্ধানে। গোরুর গাড়ির চালক কালীও সে কথায় যোগ দেয়। গাড়ির দুলুনির তালে তালে সুখের সম্ভাবনায় লখা দুঃখের গান গায়—

“পুরুইলার রুখা মাটি
ই-খরায়ে গেলেক ফাটি গো
রিলিপবাবু ফটফটিয়ে চলল জ্যালা শহরে
কেমনে হামি রহিব ঘরে...”   (খরা)

রাস্তাহীন গভীর জঙ্গল শহুরে মানুষদের কাছে এক দুর্ভেদ্য রহস্যময় ভূমি। যেখানে শবর, ভূমিজ, সাঁওতাল, মুন্ডাদের অর্থাৎ আদিবাসীদের বসবাস। প্রকৃতি এখানে উদার ও মনোরম। ঘাস কেটে বাবোই দড়ি বানাতে বানাতেই এদের জীবন কখন যেন ফুরিয়ে যায়। তবুও ঘাস কাটার কাজের আনন্দের মাঝে বিষাদের ঝুমুর গায়—

“না চাষ না ক্ষেতিকাম   ক্ষিয়ায় গেল হাতের চাম
বাবোই বুনে লাভ লুঠ না হৈল
দাদা হে, ঘাস কাইটে-কাইটেই জীবন গেল...”   (যশোমণি মুর্মু)

আবার প্রকৃতি যখন সবুজে সবুজ— রুক্ষতার লেশমাত্র নেই। পাখিরা আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে, গান গাইছে, তখন দূরে বাগাল ছোঁড়া মেয়ে দেখে প্রেমের জাগরণে রসের ঝুমুর গান শোনায়—

“আমার মনের কথা বলব কাকে
হামি মনে মনে বিহা করেছি তুমাকে
তুমার উঁচ কমর বুকের লহর করছ শাসনডাঙা-ডহর
হামি মনে মনে মন সঁপেছি তুমার মনের কাছে
তুমার নাকের লুলুক উলুক-ঝুলুক হামার মনকে সাঁতাছে...”   (যশোমণি মুর্মু)

যশোমণি মুর্মুর কড়াপড়া হাত দেখে গুণিন বলেছে 'একুশা কাত্তিক' মৃত্যু হবে। সেই ভাবনায় আগাম বেদি হয়, শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে জাগরণ মুর্মু। মাতৃবিয়োগের যন্ত্রণায় মনমরা থাকে, নেশা করে। বউ নয় একমাত্র মায়ের মন-ই সন্তানের শোকে বিহ্বল হয়, অথচ জাগরণের জীবনে মা আর থাকল না। এই সব নানান প্রশ্নের মধ্যে সে গান ধরে—

"কেহু ত কাঁদে ভালা বছর বছর রে
কেহু ত কাঁদে দেড় পহর রাতি
মাঈ ত কাঁদে ভালা বছর বছর রে
বহুই ত কাঁদে দেড় পহররাতি..." (যশোমণি মুর্মু)

'আরেক আরম্ভ' গল্পে ঘটকালি করে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় বুধন পরামানিক। চলমান গোরুর গাড়িতে বসে সে দেখে প্রাকৃতিক দৃশ্যপট ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। হাত নেড়ে নেড়ে সে মনের আনন্দে গান গায়—

"গরিব কুটুম আইলে, বন্ধু গরিব কুটুম আইলে
পান-দক্তা ধুরে থাক-রা কাঢ়ে না ভাইলে
বন্ধু, গরিব কুটুম আইলে
ভাতের কাঁধায় নাই তরকারি নখ ডুবে না ডাইলে
পরশন মাগলে রাঁধ্‌নি তখন ঝাঁপায় হাড়িশালে..." (আরেক আরম্ভ)

লোকনৃত্যের পরিচয়ে আঞ্চলিকতা ধরা পড়ে। সৈকত রক্ষিতের গল্পে লোকায়ত সমাজ জীবনের ছবি ধরা রয়েছে। ঝুমুর গানের সাথে নাচের পাশাপাশি রয়েছে খেমটি নাচ, ছো নাচ, ভালুকের নাচ, বাঁদরের নাচ ইত্যাদি। 'খেমটি' গল্পে রয়েছে খেমটি নাচের প্রসঙ্গ— এই চৈত্র মাসেই গ্রামে গ্রামে খেমটি নাচের আসর বসে। সন্ধে হতে না হতে দূরবর্তী গ্রাম থেকে বাতাসে ভেসে আসে একটানা ডুগডুগ বাজনা। কখনো হারমোনি আর ফুলোট বাঁশির আবহে খেমটির কাতর কণ্ঠ—

"হামার ভাবিতে জনম গেল
হামার কাঁদিতে জনম গেল
বঁধু তুমারি তরে..." (খেমটি)

এই খেমটির অহংকার কেবল রূপের ও যৌবনের জন্য। কারো আশ্রিতা হলেও সে অন্যের কাছে অধরা বলে আকর্ষণ কমে যায় না তার। গল্পকার 'মুখোশ' গল্পে ছো-নৃত্যপার্টির বর্তমান দুরবস্থার কথাটি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন। পালাগানে নাচের তালে একটু আধটু বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে অনেকেই। লেখকের কথায়—

"আধুনিকতার নামে মানুষ যা চাইছে তাই পরিবেশন করছে। যেমন, পালা চলাকালীন আচমকা নৃত্যরতা অপ্সরার আবির্ভাব— বোম্বের চিত্রাভিনেত্রীর নকল করে শরীর দুলিয়ে নাচ, লৌকিক বাদ্য-বাজনার বদলে সুদৃশ্য সিন্থেসাইজারের ব্যবহার, মহাদেবের ত্রিশূলে বিদ্যুতের চমক।" (মুখোশ)

'আরেক আরম্ভ' গল্পে সন্তান প্রসবের পর অজ্ঞান অবস্থাতেই ডিংলির মেয়ে সুমিত্তিরার মৃত্যু হয়। নাতনিকে স্নেহ যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখে ডিংলি। তার শত দুঃখ সত্ত্বেও দড়ির ঝুলি খাটে শিশুকে শুইয়ে বাঁদর নাচানো গান করে আর লাফ দেয়—

"আমগাছের আবু বলি আমগাছের আবু
বড় বউয়ের ছ্যেলা হৈলে নাম দিব ভাই বাবু রে
নাম দিব ভাই বাবু..." [৭৩]

সৈকত রক্ষিত পুরুলিয়ার মানুষের জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ ছবি তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পে। ছো-নাচের মুখোশ তৈরির পেশায় লোকসমাজ বছরের বিশেষ বিশেষ সময় পূজা-পার্বণ ও উৎসবের মরসুমে ব্যস্ত থাকে। 'মুখোশ' গল্পে ছো-নাচের মুখোশ তৈরির পদ্ধতির কথা জানিয়েছেন গল্পকার—

"ভীমা 'দু-মাইটা করা মুখোশগুলোতে 'কাবিচ মাটি' করে।"

তারপর তেঁতুল বিচির আঠা মাখাতে হয় মুখোশগুলোতে। তারপর তিন মিনিট অন্তর খড়িমাটি, আঠামেশানো রং দিয়ে রোদে শুকনো করে। পালার চরিত্র অনুযায়ী মুখোশের রং ঠিক করে। যেমন— গেরিমাটি, সফেদা পাউডার, বার্ণিশ হয় ঘামতেল বা গর্জন তেল দিয়ে। তারপর অ্যারারুটকে গরম জলে ফুটিয়ে দেওয়ার পর ঘামতেল লেপন ও অলংকরণ, প্রয়োজন মতো চুল বসানো হলে 'ফিনিশিং মাল'এ বিক্রির উপযুক্ত হয়।

লোকখাদ্য হিসেবে হাঁড়িয়ার পরিচয় পাই 'উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা' গল্পে—

"হাড়িয়ার নেশায় মাতাল হয়ে ওঠে ওরা"

লোকায়ত জীবনে দীর্ঘকালীন বিধিনিষেধ লোকবিশ্বাসে পরিণত হয়। এভাবেই তাদের মনে চিরকালীন কুসংস্কার থেকে যায়। সৈকত রক্ষিতের গল্পের অন্তর্বয়ানে চরিত্রের সামাজিক জীবন যাপনে কুসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

"মুটুক ডান চোখ কচলায়। বলে 'হামি ত ভিৎরে—
শাবলে মাটি তাড়তেছিলি।
প্যালারাম তার একচোখ দেখে ধমক দিয়ে ওঠে।
বলে, 'দু চৈখ মুদ। সক্কালেই—" (দাহভূমি)

'পট' গল্পে গুহিরাম অদ্ভুত পেশার সাথে যুক্ত। দীর্ঘকালীন বিশ্বাসে সামাজিক স্বীকৃতিতে তাদের এই পেশা বহমান। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ মারা গেলে গুহিরাম মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। তারপর সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। গৃহস্থ বাড়িতে গিয়ে চাল গামছা টাকা পয়সা দাবী করে। এই সামান্য প্রাপ্তিতেই গুহিরামের সংসার চলে। গুহিরামের এই চাওয়া পাওয়া মৃতবাড়ির লোকের মঙ্গল কামনার জন্য। কেননা সে বলে— 'মানলেই শিব আর না মানলে পাথর।' একদিকে শোকগ্রস্ত পরিবার অন্যদিকে অভাবী পরিবারে আবদার বা স্বর্গলাভের বার্তায় বেঁচে থাকার সময় থালা, খাট গুলি সে নিতে চায়। পটের মধ্যে থাকা ছবিগুলি দেখিয়ে সে গৃহস্থের কাছে মৃতব্যক্তির জাগতিক জীবন

সম্পর্কে ভালো মন্দের ব্যাখ্যা দেয়।

এই বিশ্বাসেই মৃতব্যক্তির বাড়ির লোকজন বুঝতে পারে গুহিরাম চোর ডাকাত না প্রকৃত পাইট্‌কার। সে চাল, গামছা, চক্ষু দানের থালা নিয়ে ভঁড়েগড়া থেকে অন্যগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আর লোকায়ত সমাজের কাছে মৃত ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস চিরন্তন কুসংস্কারে ঢাকা থাকে।

অলৌকিক শক্তির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকে অশিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষজন। 'মুখোশ' গল্পে ভীমা নিজের মেয়েকে নিয়ে গেছে অন্ধকূপের কিনারে। টিলার মাথায় রহস্যময় অন্ধকূপের সঠিক গভীরতা গ্রামবাসীরাও জানত না— এমনকি ভীমাও জানত না। কিন্তু কোনো এক অজানা অলৌকিক শক্তির বশে ভীমা তার ছোট্ট নিষ্পাপ মেয়েকে হত্যা করতে চেয়েছে ছুরি দিয়ে। কিন্তু সম্বিত ফিরে পেয়ে ভীমা বলে—

> "যে এনেছে সে কেবল ছুটুমণিকেই আনেনি, তাকেও নিয়ে এসেছে এই অন্ধকূপের কাছে। গোরস্থানে।" [৭৪]

কিন্তু এই রাতের অন্ধকারে ঘুম থেকে তুলে নির্জন ভুতুড়ে জায়গায় আনার রহস্য বলে দিয়েছে ভীমাই—'ভীমা বলল, 'বুলানা ভূত!' —এই সত্য কথনের সাথে অলৌকিকতাময় কুসংস্কারেই ভীমাদের জীবন বেঁচে থাকে।

'রাঙামাটি' গল্পে বাটি চালানোর প্রসঙ্গে গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস তথা কুসংস্কার জড়িয়ে রয়েছে। পালপাড়ার বংশী ঠাকুর বাটি চালানোতে নাম করা লোক। ঘটনার কথা আগে থেকে সব জেনে নিয়ে কি চুরি গেছে এবং কে নিতে পারে নিশ্চিত হয়ে একটি বাটি নিয়ে বসে। তারপর—

> "বাটিতে রাখে সামান্য ইঁদুর মাটি, কিছু দুব্বা ঘাস। একমুঠো ধানের ওপর সেই বাটি রেখে সে ভিড়ের মধ্যে তার নির্বাচিত লোককে সেটা ছুঁয়ে থাকতে বলে। এবং নিজে জ্বলন্ত ধূপের ধোঁয়ার সঙ্গে যখন মন্ত্র পড়তে থাকে আর থেকে-থেকে চেঁচিয়ে ওঠে,— চল, 'চল মা সিংহবাহিনী', তখন দেখা যায় বাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে। সরতে সরতে শেষমেশ তা কোনো একজনের দিকেই ধাবিত হয়।" (রাঙামাটি)

গ্রামের মানুষের মনে এই বিশ্বাস থাকলেও গল্পকার দেখিয়েছেন হারিয়ে যাওয়া শুয়োর 'নন্দলালের আস্তাকুঁড়ে সেটা চরে বেড়াচ্ছে।' ঝাঁড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্র, ডান-ভূত, ডাইনী বিদ্যার মতো প্রসঙ্গ সৈকত রক্ষিতের গল্পের বিষয়কেন্দ্রে লোকায়ত জীবনবৃত্তে অবস্থান করেছে।

'বশীকরণ' গল্পে হংসের বউ অচলা একদিন ঘাটে পড়ে যায়। তখন গ্রামের লোক হংসকে বলে— "তুমার বউয়ের মতিগতি ঠিক জানাচ্ছে নাই। ইয়াকে জরুর ডাইনের লজর লাইগেছে।" হংস এই কথায় বিশ্বাস করে না। মেয়ে মানুষ অসুখ-বিসুখ হওয়াটাই স্বাভাবিক বলেই তার বিশ্বাস। গ্রামে, পাড়ার লোকেরা তা মানতে চায় না। অচলা যে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত তা ডাক্তার পরীক্ষা করে জানিয়েছে। কিন্তু গ্রামের লোক বলেছে— 'ওসুখ-বিসুখ ফালতা কথা। তুমি সখার টিনে চল। তেলখড়ি করে ডাইন্‌কে গাঁয়ের বাহার করতে হবেক।' অথচ অচলা নির্বিকার। চুপ করে মৌন হয়ে থাকা দৃশ্যে হংসও বদলে

যায় মন খারাপের জন্য। গ্রামের লোক এবার শনি লেগেছে বলে যজ্ঞ শান্তি করতে বলে। এদিকে অচলা সর্বগ্রাসী প্রতিমূর্তি ধরে বলে— 'আমি অচলা নই! কালী বটি! মা কালী!' তার এই বার্তা গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ রোগ মুক্তির জন্য আবার কেউ ছেলে হারানোর শোক নিয়ে, কেউ পুত্র প্রাপ্তির আশায় প্রণামী সহ কালীদর্শনে ভিড় জমায়। তাদের দাম্পত্য প্রেম এবং গ্রামবাসীদের কুসংস্কার দূরে গিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়। সেই অচলার বক্তব্য দেবীর সুমধুর তর্জমা হয়ে বিধানে পরিণত হয়।

'বাজা' গল্পে সাধুবাবার মন্ত্রপুত মাদুলিই সন্তানহীন বালিকার মনে বিশ্বাস এনে দেয়। সাধুবাবা বলেন— "তোর ক-ন ভয় নাই মা। কোমরের ওই মাদ্‌লিই তোকে বরাভয় দিবেক।" [৭৫]

অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মাদুলি ব্যবহার একমাত্র উপায়। এই মাদুলির মধ্যে যে বস্তু রয়েছে তা জেনেই তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে—

> "আসলে, 'সৎসাধুর লোম' ঢুকিয়ে সিল করা এই মাদ্‌লির মধ্যেই আছে অলৌকিক ক্ষমতা।" [৭৬]

'হাম্বা' গল্পে রয়েছে গো-ভৈদার প্রসঙ্গ। ঘরে গরু মরলে অভাবের তাড়নায় ভিক্ষে মাগতে বের হয় গরুর মালিক। তখন কেবল গরুর পাঘাটি সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে সামান্য সঞ্চয় করে প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিধান রয়েছে—

> "গো— ভৈদা হলে, প্রায়শ্চিত্ত করার আগে পর্যন্ত সে মুখ খুলবে না। না ঘরে, না বাইরে। কেবল ওই অবলা পশুটির মতো প্রয়োজনে হাম্বা ডাকবে। গলাতেও বাঁধা থাকবে তার গরুর গলার ব্যবহৃত পাঘাটি। আর এই বেশ ধরে কয়েকদিন সে আশেপাশের শহরে, গ্রামে গ্রামে মাঙনে বেরবে। তাই দিয়ে শ্রাদ্ধ-শান্তি করে পাপমুক্ত হবে।" [৭৭]

এই বিশ্বাসেই বেঁচে থাকে রাঢ় অঞ্চলের অভাবী মানুষজন।

সৈকত রক্ষিতের ছোটগল্পে লৌকিক উপাদান হিসেবে আঞ্চলিক ছড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। 'উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা' গল্পে খেদুর ছোট ছেলে বুড়োর লাঠি কেড়ে নিয়ে আনন্দে ছড়া কেটেছে—

> 'এ বুঢ়া
> কুল-কুঁড়া।' [৭৮]

'আরেক আরম্ভ' গল্পে শংকরের ছেলে 'সঞ্জয়' আঁকশি দোলাতে দোলাতে ছড়া বলে—

> "এক পওসার বুট সিঝা, দু পওসার খাজাড়ি
> বাপে-ব্যাটায় লাইগে গেল দাড়ি ছিঁড়াছিঁড়ি
> ডিডিগ ডিডিগ।..." (আরেক আরম্ভ)

'কসাই' গল্পে হাড়িরাম লৌকিক ছড়া বলেছে—

‘কথায় বলে, চৈতে হুল-পাথর
বৈশাগে উথল-পাথল!’ [৭৯]

‘আঁকশি’ গল্পে গরাই-এর প্রবাদ বাক্য আসলে সৈকত রক্ষিতের সমাজ জীবন অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। গরাই বলে—

‘আম আমড়া শিমূল
ফাগুনের জলে নিমূল।’ [৮০]

এর উত্তরে মাগারাম মুচি ও তার বউ বেদেনি বুঝেছিল ফাগুন মাসের জলকে সত্যিই তারা ভয় পায়।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

রামকুমার মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়ার সাধারণ মানুষজনের লৌকিক আচার-আচরণ, জীবনচর্যা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, জীবন-জীবিকা ও দৈনন্দিন জীবনকথাকে গল্পের আধারে তুলে ধরেন। আপাত-কৌতুকময় বিবরণের ভেতর থেকে সরল সত্যকে দেখার চোখ রয়েছে লেখকের। গল্পের বয়ানে সত্যকথা বলার সাহসে আপাতভাবে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি না হয়ে গল্প উপস্থাপনার গুণে আত্মবিশ্বাস ও স্রষ্টার শক্তির প্রকাশ দেবোপম হয়েছে। তাঁর দেখার মধ্যে রয়েছে অনিত্যবোধ, কৌতুকময় বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যময় হাস্যরস। তাঁর গল্পে লৌকিক উপাদানের মধ্যে ছড়া, লোককথা, লোকসংগীত ছাড়াও বিশ্বাস-কুসংস্কার, লোকনৃত্য, মেলা, প্রবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

তারাশঙ্করের পরে লোকায়ত সমাজের নিম্নবর্গীয়দের কথা, রাঢ়বাংলার ধর্ম-সংস্কার জীবন ও সংস্কৃতির তথ্যচিত্রের রূপকার রামকুমার মুখোপাধ্যায়। জীবন-জীবিকার সাথে মিশে থাকা রাঢ়বঙ্গের মানুষ গুলি সঙ্গতিহীন, শোষণ-পীড়নে অবনত অনাড়ম্বর সরল। এদের জীবনে দুঃখ বেদনা, হাসি-আনন্দ-প্রেম, রঙ্গরস ও পরিহাসপ্রিয়তা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। অনিবার্য জীবন স্রোত অন্তরের উৎসুক থেকে নির্গত হয়ে বহু ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। 'ঘরে ফেরার পথ' গল্পের রাধাশ্যামের স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে বনবীরসিংহ-এর গাজনে যাত্রাপালার কথা। যাত্রায় বংশী চরিত্রের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, খালি গা, হাঁটু অবধি কাপড় আর কোমরে লাল গামছা গিঁট মারা। সে পাকা গাইয়ে। জোতদারের বাড়ি ঘেরাও করতে এসে সে গায়—

"আর দেব না ধান হো, কাস্তে শানাও ভাই হো, জান কবুল আর মান কবুল...।" [৮১]

বাইশ বছর গ্রাম থেকে দূরে থাকা রাধেশ্যামের উচাটন মন কথা শোনে না। বর্ধমান থেকে বনবীর সিংহের আসার আনন্দে বিগত স্মৃতিতে মগ্ন থাকে সে। জল কাদা গাড়ি ঘোড়াহীন কাঁকর রাস্তায় হেঁটে চলে রাধেশ্যামের পরিবার। বাঁকিশোল ইস্কুলটা পেরিয়ে বাগদিপাড়ায় মনসার গান কানে আসে রাধেশ্যামের। আর সে গেয়ে ওঠে—

"একটি আমার জড়ি ছিল তালের শিকড়
ঝপ্ করে না খুঁজে পাই বনের আকড়
কংগ্রেসের রাজত্ব হল অমি করব কী ?
খড় কেটে লবঙ্গ করি জল ফুটিয়ে ঘি
এই আমার গুণ ওগো শুন গুণীজনে
মা মনসা লয়ে খেলা কর সর্বজনে" [৮২]

নিজের অতীত কিংবা বর্তমান নিয়ে বিনোদের তেমন শোক দুঃখ নেই। ঘর সংসারকে গুছিয়ে দিতে পারলেই বিনোদের শান্তি। হাতে লাঙল আর মুখে ফুলুটে বিনোদ বলে ওঠে—

''মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরই ডালে
না পোড়ালে রাধার অঙ্গ না ভাসায়ো জলে।'' (মৌজা ডোমপাটি)

এরূপ ভাবনা তারশঙ্করের 'রাইকমল' উপন্যাসের সঙ্গে মিলে যায়।

বিনোদ ডোমের মন ভালো নেই। তা সত্ত্বেও দিঘির পশ্চিমপাড়ে দাঁড়িয়ে ফুলুটে সুর তুলে পথ তৈরি করে সে—

''তুই লো ধনী রাজার ঝিয়ারি
লাজের মাথা খেয়ে হলি রাখাল পিয়ারি
কালো শশী বাজায় বাঁশি মনের দুকূলে
পোড়ামুখী তুই তো গোকূলে।'' (মৌজা ডোমপাটি)

বিনোদের স্বপ্নময় জীবনে ফুলুট হল ডোমপাটির জোতজমি, গাছপালা, পুকুর-ডোবা। বিনোদের ফুলুটের ভেতর প্রকৃতি যেন সজাগ থাকে, রাত তরল হয়, সুখ-দুঃখ গোধূলির হালকা আঁধারের মতো মনের মধ্যে জাগ্রত হয়। পথ ভোলা বিনোদ নেশা মুক্তির পর নিজস্ব সুরে আশ্বস্ত হয়। সে নিজেকে চিনতে পারে—

''নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়।
সুরে বেদনা বাজে গো কোন্ হিয়া
সুখ স্মৃতি মাঝে সুর মায়া
কত দুঃখ আসে যেন আলোক ছায়া
নিশীথ রাতে জাগে তারারই সাথে।'' (মৌজা ডোমপাটি)

আদরে প্রশ্রয়ে সোহাগে যত্নে শিল্পী মন ধরা থাকে শিল্পের ক্যানভাসে। সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় প্রকৃত শিল্পীত্বকে। মহাদেব ও আমানির বিপরীতে দীনদয়াল ও ভানুমতীর প্রেমভালোবাসার দেয়াল চিত্র কখন যেন উজ্জ্বল হয়ে যায় হাতের দশ আঙুলের ছোঁয়ায়। মাতাল মহাদেব শিল্পী মহাদেবে উন্নীত হয়। বউ আমানির গলায় হাত জড়িয়ে গায়—

''বাসি ভাতে নুন নংকা নুচির মজা পুরি হে
লৈতন পিরিতির মজা চোখের ঠারাঠারি হে
চোখের ঠারাঠারি হে— '' (শিল্পী)

গ্রামীণ জীবনে মেলাপার্বণ নিত্য সঙ্গী। ভেড়া-ছাগল, গোরু-মোষের বাগাল লক্ষ্মণের কথা বলার আপনজন এইসব পশুরা। আর মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানোর সাথে বাদনা পরবের সুরে সে গান যায় মনের আনন্দে—

"অহি রে, এতদিন যে চরাই কাড়া।
রাতে রাতে খেলাল করি রে
আজ তোর দেখিব মর্দান
অহি রে— " (গোষ্ঠ)

প্রচন্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে লক্ষ্মণ ভাত খেয়ে জড়োসড়ো হয়ে পুকুর পাড়ে বসে উপেনের বাঁশি শোনে। বাঁশির সুর ছড়িয়ে যায় দূর প্রান্তে—

"প্রেম সরোবর জলে পিরিতি কমল দলে
নবীন ভ্রমরা রস খায়..." (গোষ্ঠ)

লক্ষ্মণের মতো সুচাঁদ বউয়ের সাথে ঝগড়া করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। পেটপুরে কদিন খাবার না জোটায় মরতে চায় সে। অবশেষে বিদ্যুতে শক লাগা জোড়া ঘুঘুর মাংস খেয়ে গাঁ সীমানায় এসে বিনে পয়সায় এক বোতল মদ জোগাড় করে সুচাঁদ। আর বউয়ের গা ঘেঁষে চলতে চলতে গেয়ে ওঠে—

"ঝিঙ্গালতে কাল্লালতে বাজ লাগলি
মাইরি বাজ লাগলি
তকে লাজ না লাগে লো
মুচকা হাঁসলি
মাইরি মুচকা হাঁসলি।" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ঘুঘু কিংবা মানুষ)

লোকসংগীতের সম্মোহনে রামকুমারের গল্পের চরিত্রেরা মাদকতার মতো মশগুল থাকে। আর লেখক গল্পের মধ্যে গল্প তৈরি করে চরিত্রগুলিকে কল্পনার পাখায় উড়ে যেতে সাহায্য করেন। 'জাহাজ ডুবি' গল্পে অর্ক আর সোমা মেয়ে রিনির কাছে হতাশ হয়। মদ খাওয়ার অপরাধে অর্ক অনুশোচনায় দগ্ধ হয়, সাথে সোমাও। তাই মেয়ের আবদারকে মান্যতা দেয়। ছেলেমানুষির মতো জাহাজডুবির খেলায় মেতে ওঠে এরা। আর বেজে ওঠে প্রেম-পীরিতির গান—

"বাও জানি না ও আমি বাঁক চিনি না
বাইতে দিছ নাও
ও আমার দয়াল রে ও বুঝি ডুইব্যা মরাম রে।।
তিন মোহনায় পইয়াছে নাও
(দয়াল) কোন বা দিগে যাইরে।।" (জাহাজডুবি)

'জাতিস্মর' গল্পে নেতাই-এর কণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে দেহতত্ত্বের গান—

"ওরে যেদিন পাখি যাবে উড়ে
তোমায় দেবে ফাঁকি রে
আমার মনের ময়না পাখি রে
ও আমার সোনার ময়না পাখি

যে দিন পাখি চোখ মুদিবে
পাড়া প্রতিবেশী একবার কাঁদিবে
তুলে দিয়ে কাঠের খাটে
লিয়ে যাবে শ্মশান ঘাটে
সঙ্গে দেবে হাতকড়া
পেছনে দেবে গোবর ছড়া
না ফিরিতে পারিস যাতে ঘরে রে
ও আমার মনের ময়না পাখি রে
ও আমার সোনার ময়না পাখি।" (জাতিস্মর)

এই গানের কথায় রাধার মায়ের বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়। সে ভাবে— 'স্বামীর কোলে মাথা রেখে কজন হাসতে হাসতে যেতে পারে ? সে ভাগ্যি কি করেচি ? রাধার মায়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ে।' মেঠো সুর লোকসংগীতের প্রধান উপাদান। শীতে হিমেল হাওয়ায় ধানের আঁটি বেঁধে আনতে মাঠে বেরিয়েছে সুবল। গরুর গাড়িতে বিড়ি টানতে টানতে শীতকে অমান্য করে গুনগুন করে সে—

"আমি আর কি প্রাণনাথে পাব
চাঁপা ফুলে চাঁচর চুলে মাথা না বেনাব।
ভাসিতে ভাসিতে যাই গাঙ্গুড়ের জলে।
লখিন্দর আছে শুয়ে বেহুলার কোলে।
মরা পতি লয়ে বেহুলা জলে ভেসে যায়
কলার মান্দাসে বসে কেন্দে মরে হায়।" [৮৩]

লোকগীতিগুলি কখনো প্রেমের, কখনো পূজা বা ত্যাগের। আবার কখনো প্রতিশোধ প্রতিহিংসার বিপরীতে অপার মহত্বের। লোকসুরে অপার ভালোবাসা মিশে থাকে। 'চরৈবেতি' গল্পের গোপা মুক্তমনা প্রকৃতি প্রেমিক। মনের মানুষকে খোঁজার আনন্দ তাঁর আজীবন। তাই নদীতে এলে ওপারের বউড়ি ঝিউড়িদের সাথে কথা বলে আনন্দ পায়। জানতে পারে 'বর্ধমানে তাপস পালের আসার কথা, একলকি বাজারে পূর্ণদাসের গানের কথা, আরামবাগে নট্ট কোম্পানি পালার কথা। মানুষের সঙ্গে কথা না হলেও মনের মধ্যে আপনাআপনি কথার জন্ম হয়।' —লেখকের এই অন্বেষণ ও স্বাচ্ছন্দ্য সহাবস্থানেই ভালোবাসার মানুষ চিরকালীন বেঁচে থাকে। নদীতে স্নান করতে গিয়ে গোপা শুনতে পায়—

"ও বাঁশিতে ডাকে সে শুনেছি যে আজ
মোর পরান কাড়িতে চায় সে রাখালরাজ।" [৮৪]

মনকাড়া বাঁশির সুরে বিহ্বল ও অস্থির হয়েছে গোপা। সুরের মানুষকে দুচোখ ভরে দেখতে চেয়েছে সে। আর না পেয়ে 'পাছা-গভীর জলস্রোতের সঙ্গে গোপা কথা বলে।' সে তাকিয়ে থাকে নদীর পশ্চিমে ফেলে আসা পথের দিকে নিষ্পলক ভাবে। এই গোপাই অনন্তকাল হাঁটতে থাকে মনের মানুষের খোঁজে।

হাতে একতারা গায়ে গেরুয়া বসন, আর কপালে চন্দনের টিপ, বাঁ কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি সমেত মেদিনীপুরের শালবনিতে ঠাকুর দাস বাবাজির আশ্রম থেকে মুর্শিদাবাদের শ্যাম বোষ্টমের আশ্রমে তার যাতায়াত। গোপা কৃষ্ণধ্যানে কৃষ্ণ অন্বেষণে পাগলপারা হয়ে গেয়ে ওঠে—

''মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি
বান্ধিব বসন দিয়া।।'' (চরৈবেতি)

মথুরা থেকে বৃন্দাবন। বৃন্দাবন থেকে পুরী, পুরী থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত সুরের মূর্চ্ছনায় গোপার হৃদয় মন তোলপাড় হয়েছে।

লোকজীবনের অন্যতম অঙ্গ কীর্তন গান। রাঢ়বঙ্গের মানুষদের কাছে ধর্মীয় প্রথায় এই পালাকীর্তন বিশেষ সুরের মর্যাদা পেয়ে চলেছে। যা লোক ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হলেও নাগরিক সমাজের আচার-আচারণে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লোকধর্মের মাহাত্মজ্ঞাপক সংগীত প্রচারে কীর্তন খুবই জনপ্রিয়। 'জাতিস্মর' গল্পে কীর্তনের আসরে প্রচারিত হয়—

''সে রূপ সায়রে মন যে ডুবিল
সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে মন যে সঁপিলু
আনিব কী ধন দিয়া।।'' [৮৫]

কীর্তনের গান শুনে রাধার মা বলে 'সংসারে থাকতে আর মন চায়নি। সংসার লয়, নরক।' আর কিষ্টদাসও বলেছে সংসার হল অনিত্যের বন্ধন। ভাবে বিভোর হয়ে কীর্তনীয়া যেমন গেয়ে আনন্দ পায়, তেমনি আটচালায় বাস করে কিষ্টদাসেরা শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগে ডুবে যায়—

''কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি কালা।
তবু তো সে কালা অন্তরে জাগয়ে
কালা হৈল জপমালা।।'' (জাতিস্মর)

শ্রীরাধার এই মনোবেদনা রাধার মায়ের অন্তরকে দগ্ধ করে, আর উদাস করে মনকে। 'মৌজাডোমপাটি' গল্পের বিনোদও উদাসী অভাবী মনে প্রেমের রসে মগ্ন থাকে—

'' ...মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরই ডালে না পোড়ায়ো রাধার অঙ্গ না ভাসায়ো জলে ...।''

রামকুমার মুখোপাধ্যায় গ্রামীণ মানুষের জীবন কথার লেখক। এমনকি দুঃখময়-আনন্দময় জীবনের সাথে একটু রসময়তায়, বিচিত্র স্বাদের অন্বেষণকারী মানুষের মনের কথাকে ধরতে চেয়েছেন লেখক। বলা ভালো সত্যদ্রষ্টার মতো যা দেখেছেন শুনেছেন সেইসব লৌকিক ঐতিহ্যের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর লেখায় বাউল গানের প্রসঙ্গ এসেছে—

"জয় বাবা মনোহর (রো)
তুমি মোরে দয়া করো
তোমার কৃপা বুঝতে লারি
আউল-বাউল আসে ভিখারি
(ও বাবা) আসে কত দূরান্তর
জয় বাবা মনোহর।" (জাতিস্মর)

কিষ্ট দাসের অন্তর্ধানে তার বউ বাউলদের সাথে খুঁজতে বের হয় নানান আখড়ায়। সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করে মনোহর ঠাকুরকে (দাসকে) অন্তরে ঠাঁই দিয়ে কিষ্টদাস পথকে আপন করেছে। বাউল গাইয়ে একতারায় সুর তুলে গেয়ে ওঠে ভুবন ভোলানো গান—

"তোমার কিপা বুজতে লারি
চিড়া গুড় যায় গড়াগড়ি
(কত) বিদ্ধ বিদ্ধা যুব শিশু নারী
(ও ভাই) কুড়ায় মন্দির ভিতর
জয় বাবা মনোহর . . .।" (জাতিস্মর)

বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির মধ্যে লোকগান, পালাগানের পাশাপশি তাঁর গল্পে ঝুমুর গানের পরিচয়ও রয়েছে। লোককেন্দ্রিক পরব, গাজনকে করে (বাদনাপরবে বা বৎসরের বিশেষ দিনে) ঝুমুর গানের আসর বসে। 'শিল্পী' গল্পে দীনদয়ালের মুখে ঝুমুরের প্রসঙ্গ এসেছে—

"ঝুমুর গানে রাধা যমুনাতে কলসী করে জল আনতে যায়।"

'পশ্চিম-পূর্ব' গল্পে সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পাশে চাঁদিয়ার নিচে মূল গায়েন ফুল্লরার বারোমাসের দুঃখ কথা চামর দুলিয়ে গেয়ে যায়। ফুল্লরার বেদনা আসলে গাঁ-ঘরের সংসারের নিত্য কথা। রঘু, রাঘব, দুর্গা দিগর, হারাধন বাগদিরা সুর তালে কথায় বিভোর হয়—

"কার্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম
জগ-জনে কৈল শীতনিবারণ বসন।
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়
অভাগি ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।" [৮৬]

এমনই ভাবের রাজ্যে মগ্ন থাকে 'ধ্বংস স্তূপে প্রেমালাপ' গল্পের রাজন। সে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে স্বপ্নরাজ্যে বিভোর হয়। আর সুখানন্দে গান গায়—

"শ্মশান ভালবাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি;
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।।

আর কোনো সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে
ও মা চিতা-ভস্ম চারি ভিতে,
রেখেছি মা আসিস যদি।।" [৮৭]

রাজনের মতো চরিত্রেরা গল্পকারের দৃষ্টিতে অভ্রান্ত জীবনবোধে, মূল্যবোধ ও কর্তব্যবোধে বেঁচে থাকার অর্থ খোঁজে। আবার 'গোষ্ঠ' গল্পে ছো নাচের আসরে মেঠোসুরে উপেন মদনারা নেচে নেচে গা গরম করে—

"উরর দাখিন গেদা, দাঘিন, দাঘিন গেদা,
উরর গেদা গেড়েন, গেদা গেড়েন, উরর গেদা গেড়েন।" (গোষ্ঠ)

লোকজীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সাথে ছড়ার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যে ছড়াগুলি কাব্যরস ও শিশু মনস্তত্ত্বের পরিচয়ে অমল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা উন্মোচিত হয়েছে। রাঢ় বাংলার সমাজে ব্যবহৃত ছড়াগুলি সুদীর্ঘকাল ধরে লোকমুখে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এগুলির রচয়িতার নাম ও পরিচয় রচনার সাল ও তারিখ জানা না গেলেও আঞ্চলিক ভাষায় সৃজিত রামকুমারের গল্পে উল্লিখিত ছড়াগুলির স্বাদ অনবদ্য।

'দায়বদ্ধ' গল্পে নেতাই-এর বলদ অসুস্থ হলে বলদের জিব থেকে বদরক্ত বের করে দেয় বদ্যি, বেলকাটা দিয়ে। তারপর নুন, তেল, কবরেজি গাছগাছড়া লাগায়। আর ছড়া কেটে বলে—

"নেতাই চাষার বলদ
দশ মাসেতেই গলদ
আমার ওষুধ খেলি
পরান ফিরে পেলি।" (দায়বদ্ধ)

'কবাডি কবাডি' গল্পে নীহার আনন্দে ছড়া কেটেছে—

"চিড়িয়াখানার উট
করছিল কুটকুট
তাই না দেখে ঝালিদাদা
পরিয়ে দিল বুট।
উট বেচারা শেষে
মিটি মিটি হেসে
এক্কেবারে দৌড় দিল
মরুভূমির দেশে।" (কবাডি কবাডি)

'হুর্নিং সিং-এর জীবনচরিত' গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের একটি ছড়া—

"পেঁচা ডেকেছে রাত নেমেছে
তুলসী তলায় কে
নামডিঙের ঘোড়া সিংয়ের
কঙ্কাল এসেছে
দিই চুমো সোনা ঘুমো
বুঁজ চোখের পাতা
লোহার হাতা কাজললতা
ভূতের মাসির মাথা।" [৮৮]

'আকর্ষণ বিকর্ষণ' গল্পে কালীধনের স্মৃতিচারণায় ছেলেবেলার কথা উঠে এসেছে। সর্ষের তেল মাখাতে মাখাতে তার মা ছড়া কাটতেন—

"নাকে কানে দেবে তেল
মধ্যে মধ্যে খাবে বেল
সকাল বিকাল দুবার যায়
তার কড়ি কি বদ্যি খায় ?" [৮৯]

'জাহাজ ডুবি' গল্পে অর্ক-সোমার একমাত্র মেয়ে রিনিকে ঘুম পাড়ানোর সময় হলে সোফায় পা দোলাতে দোলাতে রিনিই ছড়া কাটে—

"বড়কির বোন ছোটকি
গাবদা গবুস মোটকি
কাঁধে আঙুল মোটকে
ভাত খায় না চোটকে।" [৯০]

একটু পরে সোফায় গড়িয়ে পড়ে বিড়বিড়িয়ে বলে—

"লাল পিঁপড়ে দেখলে পরে
অমনি পালায় ছুটে।" [৯১]

রামকুমার গল্পের বয়ানে পরিপাটি করে সাজিয়েছেন রাঢ় বাংলার লৌকিক জীবন চিত্রকে। যেখানে দৈনন্দিন জীবন কথায় লৌকিক ঐতিহ্য ধরা রয়েছে— 'কার্তিক হচ্ছে ধূপ, ধুনো, বাতির মাস। সন্ধ্যে হলে আকাশে বাতি, জলে বাতি। বিকেল থেকে কুচো মেয়েরা কলার খোল সাজায়। খোলের ওপর পাঁচরকমের ফুল, পাঁচটি তুলসী পাতা, পাঁচটি দূর্বা ঘাস আর পাঁচটি কুল পাতা দিয়ে একটি দীপ আর একটি ধূপ জ্বালিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়।' ঘনশ্যাম বাগদির মেয়ে রানি সবার সঙ্গে পুকুর ঘাটে গিয়ে গলা মিলিয়ে কুলকুলতি ব্রতের ছড়া কাটে—

"কুলকুলোতি কুলবতি
অরুণ ঠাকুর বরণে

ফুল ফুটেছে চরণে
এই ফুলটি যে তুলে
সাত ভাইয়ের বুন সে।" (বাঁকুচাদের গেরস্থালি)

রাঢ় বাংলায় সারা বৎসরের নানা সময়ে মেলা পার্বণে মেতে থাকে গ্রামীণ মানুষজন। রামকুমারের ছোটগল্পে মকরসংক্রান্তি, টুসু, ভাদু, ছো, গাজন, দোলযাত্রা ইত্যাদি মেলা উৎসবের প্রসঙ্গ এসেছে। 'দায়বদ্ধ' গল্পে গাজনের মেলায় ঝান্ডি বসত। তাছাড়া—

"ঝাণ্ডি বসত রথে— গাজনে, ষোলো আনার পুজো পার্বণে— দিন দিন তা হল রোজগার ব্যাপার। ষষ্ঠী পূজো, লক্ষ্মী পুজো, রাস, বাউল, চব্বিশ প্রহর, অষ্টম প্রহর, আটকুঞ্জ সবেতেই বসে। ঝান্দি বসাবার জন্যেই পরব খোঁজা। পরবও হল। মাথাদের হাতে দু'পয়সাও এলও।" [৯২]

'আকর্ষণ বিকর্ষণ' গল্পে বিত্তবান কালীধন চাটুজ্জে পুরানো দিনের কথায় জীবনের ভালো অনুভূতি নিয়ে বাঁচতে চায়। কালীধনের মনে পড়ে—

"পদ্মপিসির সঙ্গে দিঘিতে তুষুখোলা ভাসাতে যাওয়ার কথা। খোলার ভেতর গাঁদাফুল, খোলার গায়ে বারোটা প্রদীপ। তুষুর গান মনে নেই, কিন্তু প্রতীপের সংখ্যা স্পষ্ট মনে আছে। দিঘির চারপাশ থেকে তুষু খোলা দিঘিতে নামত। কেউ ভাসিয়ে দিত ভেলা। কোনোটা মন্দির, কোনোটা বিষ্ণুমঞ্চ, কোনোটা উড়োজাহাজ। মনে হত দিঘিটা আলো নিয়ে খেলছে। শীতের ভোরে নিজেকে উষ্ণ করে নিচ্ছে।" [৯৩]

যাদের বয়স কম তারা ভেলার ভেতর থেকে বাতাসা, মন্ডা, চিঁড়ে মুখে পুরে নিত। আর যারা পাড়ে থাকত তারা ছড়া কাটত—

"সাগরে ষোলো আনা
নদীতে আধা
খালেতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ
পুকুরে গাধা।" [৯৪]

কেবল পুণ্যি সঞ্চয় নয় আনন্দে-মজার দিনগুলির স্মৃতিতে ডুবে থাকে কালীধন।

আবার 'হর্নিং সিং-এর জীবন চরিত' গল্পে দোলযাত্রায় ম্যাজিকওয়ালার আগমনে গ্রামের মানুষ মেতে থাকত। চুন, হলুদ ও লতাপাতার মিশ্রনে লোক-ঔষধ দিয়ে আদি কার্তারকে সারিয়ে তুলতে চেয়েছিল ভবমালিনী। আদিকার্তার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লে সেই সময় সোচ্চারে মন্ত্র পড়ত ভবমালিনী—

"খাং খাজারন খাঙ্গায়
কাহা গেল নন্দন বন্দন বন কাট কাটকে ?
কাহার সাতাশ দুরুয়াগড়ে
সাতাশ দুরুয়াগড়কে কাহার ?

হুক কাটে হুক বেথা কাটে
আশা কাটে বাঁশা কাটে
কাটা কুটকে সাতাশ লঙ্কা পার করে।
ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞায় গুরু করে।
গুরু জ্ঞানে আমি করি
এই বেথা ঝোরে যায় এখনি।" (হুর্নি সিং-এর জীবন চরিত)

'শাঁখা' গল্পে লোকবিশ্বাসে লোককাহিনি ঠাঁই পেয়েছে। অমূল্য শাঁখারী প্রত্যেক বছর নতুন গাঁয়ে আসে ১৩ই ফাল্গুন। প্রায় তিন-চারশ বছর পূর্বের কাহিনি গ্রামের মানুষের কাছে আজও জীবন্ত—

"পুকুরের ঠিক মাঝখানে জলে ঢেউ। সে ঢেউয়ে পদ্মপাতা দোলে। দোল খেতে খেতে সরে যায়। জেগে ওঠে দুটি হাত। যেন দুটি রাঙা পদ্ম। হাত দুটিতে অমূল্যের শ্বেতশুভ্র দুটি শাঁখা। একসময় হাত দুটি অদৃশ্য হয়।" (শাঁখা)

বহুকাল আগের এই কাহিনির সাথে অমূল্যের উত্তর পুরুষেরাও অতি পরিচিত হয়ে রয়েছে। অমূল্য মারা যাবার পর তার ছেলে, তারপর ছেলের ছেলে— 'পরে কে কে এসেছে তার হিসেব নেই। দেবী সায়রের এই কাহিনি যেন অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। অমূল্য শাঁখারী বালিডোবা থেকে ক্রোশ চারের পথ হেঁটে বিষ্ণুপুরে পৌঁছায়। 'শাঁখা পরবেন মা ?' কথার পর যেন সে এক মায়াময় অলৌকিক দৃশ্য দেখে—

"যেন আকাশ থেকে নেমে আসে মেয়েটি মন্দিরের মন্ডপে বসে পা দোলায়। কতই বা বয়স হবে— চৌদ্দ-পনেরো। সিঁথিতে দগেদগে সিঁদুর, পরনে লাল পেড়ে শাড়ি। গায়ের রঙ দুধে আলতায় গোলা। হাত বাড়িয়ে দেয় মেয়েটি। ডান হাতখানি কোলের ওপর তুলে নেয় অমূল্য। ননীর হাত। ডান হাতে শাঁখা পরিয়ে বাঁ হাতখানি টেনে নেয়। হাতের গাঁটের ওপর দিয়ে যেন ভেসে যায় শাঁখাটি। মেয়েটি ঘরের দোরটা দেখিয়ে দেয়। দোরের সামনে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকিয়েছিল অমূল্য। দেখে পথ আলো করে মেয়েটি হেঁটে যাচ্ছে পুকুর ঘাটের দিকে।" [৯৫]

রামকুমারের অনেক গল্পে লোক প্রবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদগুলি গ্রামীণ জীবন কাহিনির সাথে যুক্ত দীর্ঘদিনের অভ্যেসের ফল। ফলে আঞ্চলিকতার পার্থক্যে প্রবাদগুলির ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য ধরা পড়ে—

১. 'মাগা ভাত, মাগের লাথ' (পিকনিক)

২. 'কলকেতার তেঁতুল টক হয় না।' (পিকনিক)

৩. 'বউ আনতে কড়ি, ঘর বাঁধতে দড়ি।' (বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি)

৪. 'আখ দেয়নি হাতে, খায় মাগের পাতে।' (হাভাতে)

৫. 'পর হয়েছে ঘর, শাশুড়ি হল পর।' (পিঁপড়ে)

অনিল ঘড়াই

অনিল ঘড়াই নির্মবর্গের অতি সাধারণ মানুষ হয়েও গভীর মমতায় ও ভালোবাসায় অনামী মানুষের জীবন যাত্রার শরিক হয়ে তাদের লোকায়ত জীবন দর্শনে মগ্ন থেকেছেন। এই ভিন্ন ধর্মী দার্শনিক অনুভবে গল্পের চরিত্রগুলো সজীব ও কমনীয়। প্লট ও টেকনিকের জটিলতা কাটিয়ে অজ্ঞাত-অখ্যাত জীবনের স্পন্দমান খন্ডচিত্রগুলি ফুটে উঠেছে অসীম হার্দিক উচ্ছ্বাসে। শহরের হুল্লোড় থেকে বহুদূরে থাকা নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মৃদু শব্দ তার গল্পে শোনা যায়। আর প্রত্যক্ষগোচর হয় লোকায়ত জীবন। যে জীবনে লোক-বিশ্বাস, সংস্কার, লোকগান, লোকমন্ত্র, লোকছড়া, লোকউৎসব-পার্বণ, লোকায়ত টোটকা ইত্যাদি নিত্যসঙ্গী। আর এইসব বিষয়ভাবনা গল্পের আধারে নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন অনিল ঘড়াই। যেমন—

'কটাশ' গল্পের অন্ধভাকু হাটের দিনে দুটো পয়সা পাওয়ার আশায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরে—

'পটাশ পুরের কটাশ গো, ধড়িবাজের রাজা
কুঁকড়া ধরে মৎস্য মারে
তার হবেনি সাজা ? বলি চলো গো, চলো গো-ও-ও
কটাশ ধরিতে এ-এ-এ।' [৯৬]

এই গান অন্ধভাকুর জীবনের একমাত্র সঙ্গী। তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। ভোটের সময় এই অন্ধভাকু ছকুবাবুকে কেন্দ্র করে গান বেঁধে চমকে দেয়—

'পিতার নাম হেমন্ত সাউ চালের কারবারী
ছেলে তার ছকু সাউ ভোটের বেপারী
বাবু, ভোট দিন গো— গাঁয়ে রাস্তা হবে...।' (কটাশ)

গান বেঁধে মেঠোসুরে মজে থাকা রাঢ় অঞ্চলের মানুষের কাছে পরম আনন্দের বিষয়। কৃষ্টযাত্রার আসরে অভাগী রাধিকার ক্রন্দনরত অবস্থা দেখে লেখক অনিল ঘড়াই আজকের বাস্তব সামাজিক অবস্থা তুলে ধরেছেন— 'একজন বাঁশি শুনে পাগল, অন্যজন পেটের জ্বালায় পাগল। একজন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, অন্যজন পয়সার প্রেমে বেশ্যা।' [৯৭] উপস্থিত জনতা গানের মূর্চ্ছনায় ডুবে যায়—

'আজ কেন গো নিধুবনে
রাঝা-কৃষ্ণ একাসনে

দোলনায় সুখে নিদ্রা যায় গো
নিদ্রা যায় গো-ও-ও।' (কটাশ)

গল্পকার 'আগোলদার' গল্পে কবিগানের প্রসঙ্গ এনেছেন। সহজসরল জিতুয়ার মনে এসেছে প্রহ্লাদ কবিয়ালের গান—

'চক্ষু থাকিতে লজর নাইকো যার
বলি ভাই, পুকাড়ে কপাল তার
হাড় থাকতে কেঁচুয়া স্বভাব যার
বলি ভাই, অন্ন জোটে না তার...' (আগোলদার)

পরীযান প্রসঙ্গে লেখকের কথা— 'পরীযান হিলা পালকি। সাজিইগুছিই রাখা পালকি।' এই পালকির গান ছ'বেহারার গলায় শোনা যায়—

'চাল ভাজা তিলে ভাজা
বর্ষা রাত বৌয়ের হাত
হেই আ হোও হৈ আ হো-ও-ও
হে-ই-ই হা হো-ও-ও-ও' (পরীযান)

নারাণ দাসের মৃত্যু নিয়ে গ্রামের দাস পাড়ায় শ'পাঁচেক লোকের সামনে হ্যাজাকের নিভু নিভু আলোয় বোলান গানের আসর বসে। লোকে শোনে সেই হৃদয় বিদারক গান—

'হায় হায় লারাণ
রক্ত ঝরে হল কাঁড়ান (প্রথম চাষ)!
কুথায় রইলি ফোটা জবা ফুল ?
চাঁদ ওঠে, ফুল ফোটে— বুঝতে পারি ভুল।' (দ্বন্দ্বযুদ্ধ)

'ভোটবুড়া' গল্পের চৈতনবুড়া অভাবী মানুষ। জীবনে কোনো দিন সুখ কি জিনিস তা সে জানে না। নবকুমার তাকে বিড়ি না দিয়ে চারটে রসগোল্লা খাওয়ালে সে নবকুমারকে আশীর্বাদ করে। আর মনের আনন্দে গান গায়—

'ওগো, কে গো তুমি
একাকিনী বসি নদীর কূলে
কন্যা যাচ্ছো হেলে-দুলে
বনমালী হে-এ-এ-এ!' (ভোটবুড়া)

গুণিন নরহরি মন্ত্র বলে বিষ নামানোর কাজ করে ল্যাংটো কাল থেকে। গ্রাম্য মানুষদের আপদ-বিপদে এই নরহরির মতো মানুষেরাই প্রকৃত জীবনদাতা। এ রকমই বিশ্বাস চলে এসেছে। যা কুসংস্কারও বটে। নরহরির বিষ ঝাড়ার মন্ত্র হল—

‘উঁচু কপাল বেহুলা তুর চিকন চিকন দাঁত—
অকালে খাওয়াল পতি না পোহাল রাত।
বেহুলা তুর বুকের ভেতর সর্প করে বাস,
সেই সর্প ধরে আন বিটি না হলে সর্বনাশ।’ (দ্বন্দ্বযুদ্ধ)

‘বগলাহুট’ গল্পে লোকছড়ার প্রসঙ্গ এসেছে। গংগার সইরা গংগাকে খেপিয়ে দিতে ছড়া কেটেছে—

‘বদনা চোরের বিটি
তাকায় মিটিমিটি
দিনমানে ভালই
রাতকালে গিরগিটি।’ (বগলাহুট)

গরীব বলে খেতে পরতে না পাওয়া অভাবী মেয়ে গংগাকে তারা এভাবে ছড়া কেটে অপবাদ দেয়। ‘ন্যাসা বাগ্‌দি শেয়াল ধরতে যায়’ গল্পে বিশ্বস্ত ও পুরানো চাকর হিসেবে ন্যাসা বাগ্‌দির তুলনা হয় না। সে আজীবন বাবুদের বাড়িতে কাজ করে এসেছে। তাই ন্যাসার প্রতি বড়বাবুর ভালোবাসা জন্মেছে। বড়বাবু মরবার সময় বঙ্কিমবাবুকে এই গভীর সত্যটি প্রবাদমূলক বাক্যে বলে যায়— ‘পুরনো চাল আর পুরনো মানুষ পুরনো ঘিয়ের চেয়েও দামী।’ [৯৮]

সূত্রনির্দেশ

১. তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, সপ্তম মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ. ৯৭

২. তদেব, পৃ. ১২৫

৩. তদেব, পৃ. ১২৯

৪. তদেব, পৃ. ১২৯

৫. তদেব, পৃ. ১৩৪

৬. তদেব, পৃ. ১৪৬

৭. তদেব, পৃ. ৩১৬

৮. তদেব, পৃ. ৩১৮

৯. তদেব, পৃ. ২১৪

১০. তদেব, পৃ. ৩৫৮

১১. তদেব, পৃ. ৪৫৭

১২. তদেব, পৃ. ৪৫৮

১৩. তদেব, পৃ. ২০১

১৪. তদেব, পৃ. ৩৬৪

১৫. তদেব, পৃ. ৮৫২

১৬. তদেব, পৃ. ৩৬৮

১৭. তদেব, পৃ. ৩৬৮

১৮. তদেব, পৃ. ৩৬৮

১৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার সাহিত্য জীবন, আকাদেমি সংখ্যা, ২য় সংস্করণ, ২০১১, পৃ. ৪৯

২০. গুণময় মান্না, গল্প সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ২৮৭

২১. তদেব, পৃ. ২৭৫

২২. মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ২য় সংস্করণ, ২০০৯, পৃ. ১৭০

২৩. তদেব, পৃ. ১৯৮

২৪. মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র, দ্বাদশ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ৫১৮

২৫. তদেব, পৃ. ৫২০

২৬. তদেব, পৃ. ৫০৪

২৭. মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ২য় সংস্করণ, ২০০৯, পৃ. ৮৭

২৮. ভগীরথ মিশ্র, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ১৩৭

২৯. তদেব, পৃ. ১৩৭

৩০. তদেব, পৃ. ১৩৭

৩১. তদেব, পৃ. ১৩৭

৩২. তদেব, পৃ. ১৩৭

৩৩. তদেব, পৃ. ১৩৭

৩৪. তদেব, পৃ. ১৩৭

৩৫. তদেব, পৃ. ১৪৪

৩৬. তদেব, পৃ. ১৪৪

৩৭. তদেব, পৃ. ১৪৪

৩৮. তদেব, পৃ. ১৪৪

৩৯. তদেব, পৃ. ১৪৫

৪০. তদেব, পৃ. ২৩১

৪১. তদেব, পৃ. ২৬২

৪২. তদেব, পৃ. ২৬২

৪৩. তদেব, পৃ. ২৫৯

৪৪. তদেব, পৃ. ২৬২

৪৫. তদেব, পৃ. ২৬০

৪৬. তদেব, পৃ. ২৫৮

৪৭. অমর মিত্র, পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প, সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৫০১

৪৮. তদেব, পৃ. ৫০২

৪৯. অমর মিত্র, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ৪২১

৫০. তদেব, পৃ. ৩৭৫

৫১. তদেব, পৃ. ৩৬৫

৫২. তদেব, পৃ. ৩৬৮

৫৩. তদেব, পৃ. ৩৬৮

৫৪. তদেব, পৃ. ৩৬৮

৫৫. তদেব, পৃ. ২৫৭

৫৬. তদেব, পৃ. ৩৭১

৫৭. অমর মিত্র, পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প, সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৫০২

৫৮. অমর মিত্র, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ৩৬৭

৫৯. অমর মিত্র, পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প, সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ২৭৭

৬০. তদেব, পৃ. ২৮২

৬১. তদেব, পৃ. ২৮৫

৬২. তদেব, পৃ. ২৯১

৬৩. তদেব, পৃ. ২৯২

৬৪. তদেব, পৃ. ২৯৯

৬৫. মানব চক্রবর্তী, সমীপেষু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ১২

৬৬. তদেব, পৃ. ১৯

৬৭. নলিনী বেরা, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ৩৭

৬৮. তদেব, পৃ. ৯৪

৬৯. তদেব, পৃ. ১১৬

৭০. তদেব, পৃ. ১১৪

৭১. তদেব, পৃ. ১৪৯

৭২. সৈকত রক্ষিত, উত্তর কথা, সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ, পারুল, ২০১৫, পৃ. ১৫

৭৩. তদেব, পৃ. ৩০৭

৭৪. তদেব, পৃ. ১৩৭

৭৫. তদেব, পৃ. ৩৭৭

৭৬. তদেব, পৃ. ৩৭৭

৭৭. তদেব, পৃ. ১৫৪

৭৮. তদেব, পৃ. ২৩০

৭৯. তদেব, পৃ. ৩২৫

৮০. তদেব, পৃ. ১৯

৮১. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, গল্প সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৭

৮২. তদেব, পৃ. ১৯৯

৮৩. তদেব, পৃ. ১৭৩

৮৪. তদেব, পৃ. ১৮২

৮৫. তদেব, পৃ. ১৫৮

৮৬. তদেব, পৃ. ৪০৮

৮৭. তদেব, পৃ. ৪৭২

৮৮. তদেব, পৃ. ৪৫৪

৮৯. তদেব, পৃ. ১৪৩

৯০. তদেব, পৃ. ৩৬০

৯১. তদেব, পৃ. ৩৬০

৯২. তদেব, পৃ. ৭৪

৯৩. তদেব, পৃ. ১৩৯

৯৪. তদেব, পৃ. ১৩৯

৯৫. তদেব, পৃ. ২৪২

৯৬. অনিল ঘড়াই, পরীয়ান ও অন্যান্য গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, ২০০৩, পৃ. ২৯১

৯৭. তদেব, পৃ. ৩০৪

৯৮. তদেব, পৃ. ৯৯